বিজ্ঞানরহস্য

অর্থাৎ

১২৭৯।৮০ শালের

বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ।

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

কাঁটালপাড়া।

বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রী হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৭৫।

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞানরহস্য

অর্থাৎ

১২৭৯।৮০ শালের

বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ।

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।

কাঁটালপাড়া।

বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রী হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৭৫।

CONTENTS.

সূচিপত্র।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত হইয়া এই কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধগুলি লেখকের সন্তোষজনক হয় নাই—কৃতবিদ্য পাঠকেরও হইবার সম্ভাবনা নাই। বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের আলোচনায় অনেক পুস্তকের সাহায্য প্রয়োজন করে; এ সকল প্রবন্ধ যেখানে লিখিত হইয়াছিল, সেখানে বৈজ্ঞানিক পুস্তক পাওয়া কষ্টকর। অনেক কথা কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে,—অথচ স্মৃতির ন্যায় বিশ্বাসঘাতিনী কেহ নাই। লিখিতবিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণ জন্য অনেক সময় আবশ্যক, লেখক, সময়াভাবে নিতান্ত কাতর। অতএব এই সকল প্রবন্ধে যে অনেক ভ্রান্তি আছে, ইহা নিতান্ত সম্ভব। যিনি যেখানে যে ভ্রম দেখিবেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহা লেখককে জানাইবেন ভবিষ্যতে তাহা সংশোধন করা যাইবে।

এই সকল প্রবন্ধ প্রধানতঃ হক্‌স্লী, টিণ্ডল, প্রক্‌টর, লকিয়র, লায়েল প্রভৃতি লেখকের মতাবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। কোন-টিই অনুবাদ নহে। তবে টিণ্ডল সাহেবের "Dust and Disease" নামক প্রবন্ধের সার মর্ম্মে, "ধূলা," গ্লেশর সাহেবের গ্রন্থ হইতে "গগন-পর্য্যটন" হক্‌স্লীর "Lay Sermons" হইতে জৈবনিক, এবং লায়েল সাহেবের "Antiquity of Man" হইতে "কতকাল মনুষ্য?" নামক প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে।

লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য এই, যে আলোচিত বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব সকল সাধারণ বাঙ্গালি পাঠক, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বালকেরা, এবং আধুনিক শিক্ষিতা বাঙ্গালী স্ত্রী, বুঝিতে পারেন। কতদূর এ উদ্দেশ্য সফল হইবে, বলিতে পারি না।

শ্রীদীপেন্দ্রনাথ ভঞ্জ

বিজ্ঞানরহস্য।

—০○০—

আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত।

১৮৭১ শালে সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকা-নিবাসী অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ ইয়ঙ্ সাহেব যে আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, এ-রূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড মনুষ্য চক্ষে প্রায় আর কখন পড়ে নাই। তত্তুলনায় এট্‌না বা বিসিউবি-য়সের অগ্নিবিপ্লব, সমুদ্রোচ্ছ্বাসের তুলনায় দুগ্ধ-কটাহে দুগ্ধোচ্ছ্বাসের তুল্য বিবেচনা করা যা-ইতে পারে।

যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যার সবিশেষ অনুশীলন করেন নাই, এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাঁহাদের বোধগম্য করার জন্য সূর্য্যের প্রকৃতিসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

সূর্য্য অতি বৃহৎ তেজোময় গোলক। এই গোলক, আমরা অতি ক্ষুদ্র দেখি, কিন্তু উহা বাস্তবিক কত বৃহৎ, তাহা পৃথিবীর পরিমাণ না বুঝিলে বুঝা যাইবে না। সকলে জানেন যে, পৃথিবীর ব্যাস ৭০৯১ মাইল। যদি পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ এক মাইল প্রস্থ, এমত খণ্ডে২ ভাগ করা যায়, তাহাহইলে, উনিশ কোটি, ছয়ষট্টি লক্ষ ছাব্বিশ হাজার এইরূপ বর্গ মাইল পাওয়া যায়। এক মাইল দীর্ঘ, এক মাইল প্রস্থে, এবং এক মাইল উর্দ্ধে, এরূপ ২৫৯, ৮০০০০০,০০০ ভাগ পাওয়া যায়।

আশ্চর্য্য বিজ্ঞানবলে পৃথিবীকে ওজন করাও গিয়াছে। ওজনে পৃথিবী যত টন হই য়াছে, তাহা নিম্নে অঙ্কের দ্বারা লিখিলাম। ৬,০৬৯,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০। এক

টন সাতাশ মনের অধিক।

এই সকল অঙ্ক দেখিয়া মন অস্থির হয়; পৃথিবী যে কত বৃহৎ পদার্থ, তাহা বুঝিয়া উ- ঠিতে পারি না। এক্ষণে যদি বলি যে, এমত অন্য কোন গ্রহ বা নক্ষত্র আছে যে, তাহা পৃ- থিবী অপেক্ষা, ত্রয়োদশ লক্ষ গুণে বৃহৎ, তবে কে না বিস্মিত হইবে? কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্য পৃথিবী হইতে ত্রয়োদশ লক্ষগুণে বৃহৎ। ত্র- য়োদশ লক্ষটি পৃথিবী একত্র করিলে সূর্য্যের আয়তনের সমান হয়।

তবে আমরা সূর্য্যকে এত ক্ষুদ্র দেখি

কেন? উহার দূরতাবশতঃ। পূর্ব্বতন গণনানুসারে সূর্য্য পৃথিবী হইতে সার্দ্ধ নয় কোটি মাইল দূরে স্থিত বলিয়া জানা ছিল। আধুনিক গণনায় স্থির হইয়াছে যে, ৯১,৬৭৮০০০ মাইল অর্থাৎ এক কোটি, চতুর্দ্দশ লক্ষ, ঊনসপ্ততি সহস্র সার্দ্ধ সপ্তশত যোজন, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরতা। এই ভয়ঙ্কর দূরতা অনুমেয় নহে। দ্বাদশ সহস্র পৃথিবী শ্রেণীপরম্পরায় বিন্যস্ত হইলে, পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত পায় না।

এই দূরতা অনুভব করিবার জন্য একটি উদাহরণ দিই। অস্মদাদির দেশে রেলওয়ে ট্রেণ ঘণ্টায় ২০ মাইল যায়। যদি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত রেইলওয়ে হইত, তবে কত কালে সূর্য্যলোকে যাইতে পারিতাম? উত্তর —যদি দিনরাত্রি ট্রেণ, অবিরত, ঘণ্টায় বিশ

মাইল চলে, তবে ৫২০ বৎসর ৬মাস ১৬দিনে সূর্য্য লোকে পৌঁছান যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ট্রেণে চড়িবে, তাহার সপ্তদশ পুরুষ ঐ ট্রেণে গত হইবে।

এক্ষণে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, যে সূর্য্য-মণ্ডলমধ্যে অণুবৎ ক্ষুদ্রাকৃতি পদার্থও বাস্তবিক অতি বৃহৎ। যদি সূর্য্য মধ্যে আমরা একটি বালির মত বিন্দুও দেখিতে পাই, তবে তাহাও লক্ষ ক্রোশ বিস্তার হইতে পারে।

কিন্তু সূর্য্য এমনি প্রচণ্ড রশ্মিময় যে, তাহার গায়ে বিন্দু বিসর্গ কিছু দেখিবার সম্ভাবনা নাই। সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া দেখিলেও অন্ধ হইতে হয়। কেবল সূর্য্যগ্রহণের সময়ে সূর্য্য-তেজঃ চন্দ্রান্তরালে লুকায়িত হইলে, তৎপ্রতি দৃষ্টি করা যায়। তখনও সাধারণ লোকে চ-

ক্ষের উপর কালিমাখা কাঁচ না ধরিয়া, হৃত-
তেজা সূর্য্য প্রতিও চাহিতে পারে না।

সেই সময়ে যদি কালিমাখা কাঁচ ত্যাগ করিয়া, উত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা সূর্য্য প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তবে কতকগুলি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়। পূর্ণ গ্রাসের সময়ে, অ-র্থাৎ যখন চন্দ্রান্তরালে সূর্য্যমণ্ডল লুক্কায়িত হয়, সেই সময়ে দেখা যাইবে যে, লুক্কায়িত মণ্ডলের চারিপার্শ্বে, অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় কি-রীটী মণ্ডল তাহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। ইউ-রোপীয় পণ্ডিতেরা ইহাকে "করোনা" বলেন। কিন্তু এই কিরীটী মণ্ডল ভিন্ন, আর এক অ-দ্ভুত বস্তু কখন২ দেখা যায়। কিরীটীমূলে, ছায়াবৃত সূর্য্যের অঙ্গের উপরে সংলগ্ন, অথচ তাহার বাহিরে, কোন দুর্জ্ঞেয় পদার্থ উ-

দ্গাত দেখা যায়। যথা (ক)। ঐ সকল উ-

দ্গাত পদার্থ দেখিতে এত ক্ষুদ্র যে, তাহা দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে দেখা যায় না। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় বলিয়াই তাহা বৃহৎ অনুমান করিতে হইতেছে। উহা কখন২ অর্দ্ধ লক্ষ মাইল উচ্চ দেখা গিয়াছে। ছয়টি পৃথিবী উপর্য্যুপরি সাজাইলে এত উচ্চ হয়
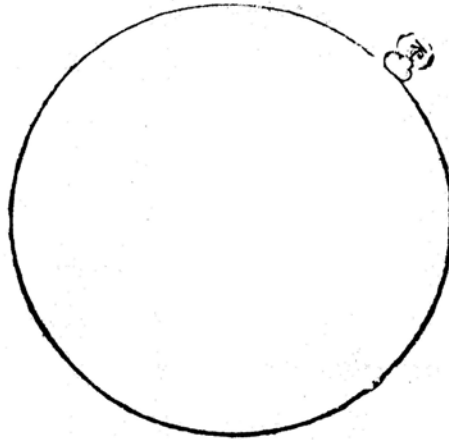
না। এই সকল উদ্গত পদার্থের আকার কখন পর্ব্বত শৃঙ্গবৎ, কখন অন্যপ্রকার কখন সূর্য্য হইতে বিযুক্ত দেখা গিয়াছে। তাহার বর্ণ কখন উজ্জ্বলরক্ত, কখন গোলাপী, কখন নীলকপিশ।

পণ্ডিতেরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এ সকল সূর্য্যের অংশ। প্রথমে কেহ২ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, এ সকল সৌর পর্ব্বত। পরে সূর্য্য হইতে তাহার বিয়োগ দেখিয়া সে মত ত্যাগ করিলেন।

এক্ষণে নিঃসংশয় প্রমাণ হইয়াছে যে, এই সকল বৃহৎ পদার্থ সূর্য্যগর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত। যেরূপ পার্থিব আগ্নেয় গিরি হইতে দ্রব বা বায়বীয় পদার্থ সকল উৎপতিত হইয়া, গিরিশৃঙ্গের উপরে মেঘাকারে দৃষ্ট হইতে পারে, এই সকল সৌরমেঘও তদ্রূপ। উৎক্ষিপ্ত বস্তু

যত ক্ষণ না সূর্য্যোপরি পুনঃ পতিত হয়, তত-ক্ষণ পর্য্যন্ত স্তূপাকারে পৃথিবী হইতে লক্ষ্য হইতে থাকে।

এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, এইরূপ একখানি সৌরমেঘ বা স্তূপ দূরবী-ক্ষণে দেখিলে কি বুঝিতে হয়। বুঝিতে হয় যে, এক প্রকাণ্ড প্রদেশ লইয়া এক বিষম বি-প্লব উপস্থিত হইয়াছে। সেই সকল উৎপাত-কালে সূর্য্যগর্ভনিক্ষিপ্ত পদার্থরাশি, এতাদৃশ বহুদূরব্যাপী হয়, যে তন্মধ্যে এই পৃথিবীর ন্যায় অনেক গুলিন পৃথিবী ডুবিয়া থাকিতে পারে।

এইরূপ সৌরোৎপাত অনেকেই প্রফেসর ইয়ঙের পূর্ব্বে দেখিয়াছেন; কিন্তু প্রফেসর ইয়ঙ্ যাহা দেখিয়াছেন, তাহা আবার বিশেষ

বিস্ময়কর। গত ৭ই সেপ্টেম্বরে, বেলা দুই প্রহরের সময়ে তিনি সূর্য্যমণ্ডল দূরবীক্ষণদ্বারা অবেক্ষণ করিতেছিলেন। তৎকালে গ্রহণাদি কিছু ছিল না। পূর্ব্বে গ্রহণের সাহায্য ব্যতীত কেহ কখন এই সকল ব্যাপার নয়নগোচর করে নাই, কিন্তু ডাক্তার হাগিন্স প্রথমে বিনা গ্রহণে এ সকল ব্যাপার দেখিবার উপায় প্রদর্শন করেন। প্রফেসর ইয়ঙ্ এরূপ বিজ্ঞানকুশলী যে, তিনি সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজের সময়েও ঐ সকল সৌরস্তূপের আতপচিত্র পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কথিত সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ্ দূরবীক্ষণে দেখিতেছিলেন যে, সূর্য্যের উপরি ভাগে এক খানি মেঘবৎ পদার্থ দেখা যাইতেছে। অন্যান্য উপায় দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, পৃথিবী যেরূপ বায়বীয় আবরণে বেষ্টিত, সূর্য্যম-

গুলও তদ্রূপ। ঐ মেঘবৎ পদার্থ সৌরবায়ুর উপরে ভাসিতেছিল। পাঁচটি স্তম্ভের ন্যায় আধারের উপরে উহা আরূঢ় দেখা যাইতেছিল। প্রফেসর ইয়ঙ্ পূর্ব্ব দিন বেলা দুই প্রহর হইতে ঐ রূপই দেখিতেছিলেন। তদবধি তাহার পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণই দেখেন নাই। স্তম্ভগুলিন উজ্জ্বল, মেঘখানি বৃহৎ—তদ্ভিন্ন মেঘের নিবিড়তা বা উজ্জ্বলতা কিছুই ছিল না। সূক্ষ্ম২ সূত্রাকার কতকগুলি পদার্থের সমষ্টির ন্যায় দেখাইতেছিল। এই অপূর্ব্ব মেঘ সৌরবায়ুর উপরে পঞ্চদশ সহস্র মাইল ঊর্দ্ধে ভাসিতেছিল। ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রফেসর ইয়ঙ্ ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থও মাপিয়াছিলেন। তাহার দৈর্ঘ্য লক্ষ মাইল—প্রস্থ ৫৪০০০মাইল। বারটি পৃথিবী সারি২ সাজাইলে, তাহার দৈর্ঘ্যের সমান হয় না—ছয়টি

পৃথিবী সারি২ সাজাইলে, তাহার প্রস্থের সমান হয় না।

দুই প্রহর বাজিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা হইলে, মেঘ এবং তন্মূলস্বরূপ স্তম্ভগুলির অবস্থাপরিবর্ত্তনের কিছু২ লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। সেইসময়ে প্রফেসর ইয়ঙ্ সাহেবকে দূরবীক্ষণ রাখিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইল। একটা বাজিতে পাঁচ মিনিট থাকিতে, যখন তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন দেখিলেন, যে চমৎকার! নিম্ন হইতে উৎক্ষিপ্ত কোন ভয়ঙ্কর বলের বেগে মেঘখণ্ড ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে সৌর গগন ব্যাপিয়া ঘনবিকীর্ণ উজ্জ্বল সূত্রাকার পদার্থ সকল ঊর্দ্ধে ধাবিত হইতেছে। ঐ সূত্রাকার পদার্থ সকল অতি প্রবল বেগে ঊর্দ্ধে ধাবিত হইতেছিল।

সর্ব্বাপেক্ষা এই বেগই চমৎকার। আ-

লোক, বা বৈদ্যুতীয় শক্তি প্রভৃতি ভিন্ন, গুরুত্ববিশিষ্ট পদার্থের এরূপ বেগ শ্রুতিগোচর হয় না। ইয়ঙ্ সাহেব যখন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তখন ঐ সকল উজ্জ্বল সূত্রাকার পদার্থ লক্ষ মাইলের ঊর্দ্ধে উঠে নাই। পরে দশ মিনিটের মধ্যে যাহা লক্ষ মাইলে ছিল, তাহা দুই লক্ষ মাইলে উঠিল। দশ মিনিটে লক্ষ মাইল গতি হইলে, প্রতি সেকেণ্ডে ১৬৫ মাইল গতি হয়। অতএব উৎক্ষিপ্ত পদার্থের দৃষ্ট গতি এই।

এই গতি কি ভয়ঙ্কর, তাহা মনেরও অচিন্ত্য। কামানের গোলা অতিবেগবান হইলেও কখন এক সেকেণ্ডে অর্দ্ধ মাইল যাইতে পারে না। সচরাচর কামানের গোলার বেগের বহু শত গুণ এই সৌর পদার্থের বেগ, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

দুই লক্ষ মাইল ঊর্দ্ধেত এই বেগ দেখা গিয়াছিল। যে উৎক্ষিপ্ত পদার্থ দুই লক্ষ মাইল ঊর্দ্ধে এত বেগবান্, নির্গমকালে তাহার বেগ কিরূপ ছিল? সকলেই জানেন যে, যদি আমরা একটা ইষ্টক খণ্ড ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত করি, তাহাহইলে যে বেগে তাহা নিক্ষিপ্ত হয়, সেই বেগ শেষপর্য্যন্ত থাকে না, ক্রমে মন্দীভূত হইয়া, পরিশেষে একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, ইষ্টক খণ্ডও ভূপতিত হয়। ইষ্টকবেগের হ্রাসের দুই কারণ, প্রথম পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তি, দ্বিতীয় বায়ুজনিত প্রতিবন্ধকতা। এই দুই কারণই সূর্য্যলোকে বর্ত্তমান। যে বস্তু যত গুরু, তাহার মাধ্যাকর্ষণী শক্তি তত বলবতী। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণী শক্তি সূর্য্যের নাড়ীমণ্ডলে ২৮ গুণ অধিক। তদুল্লঙ্ঘন করিয়া লক্ষ ক্রোশ পর্য্যন্ত যদি

কোন পদার্থ উত্থিত হয়, তবে তাহা যখন সূর্য্যকে ত্যাগ করে, তৎকালে তাহার গতি প্রতি সেকেণ্ডে অবশ্যই ১৬৬ মাইল ছিল। ইহা গণনা দ্বারা সিদ্ধ। কিন্তু যদিও এই বেগে উৎক্ষিপ্ত হইলে, ক্ষিপ্ত বস্তু লক্ষ ক্রোশ উঠিতে পারিবে, তাহা যে ঐ লক্ষ ক্রোশের শেষার্দ্ধ লঙ্ঘনকালে প্রতি সেকেণ্ডে ১৬৬ মাইল ছুটিবে, এমত নহে। শেষার্দ্ধ বেগ গড়ে ৬৫ মাইল মাত্র হইবে। প্রাক্টর সাহেব গুড্‌ওয়ার্ডসে লিখিয়াছেন যে, যদি বিবেচনা করা যায় যে সূর্য্যলোকে বায়বীয় প্রতিবন্ধকতা নাই, তাহাহইলে এই উৎক্ষিপ্ত পদার্থ সূর্য্যমধ্য হইতে যে বেগে নির্গত হইয়াছিল, তাহা প্রতি সেকেণ্ডে ২৫৫ মাইল। কর্ণহিলের একজন লেখক বিবেচনা করেন যে, এই পদার্থ প্রতি সেকেণ্ডে ৫০০ মাইলের অধিক

বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু সূর্য্যলোকে যে বায়বীয় পদার্থ নাই, এমত কথা বিবেচনা করিতে পারা যায় না। সূর্য্য যে গাঢ় বাষ্পমণ্ডল পরিবৃত, তাহা নিশ্চিত হইয়াছে। প্রাক্টর সাহেব সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীতে বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার যেরূপ বল, সৌর বায়ুর প্রতিবন্ধকতার যদি সেইরূপ বল হয়, তাহাহইলে এই পদার্থ, যখন সূর্য্য হইতে নির্গত হয়, তখন তাহার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে আনুমানিক সহস্র মাইল ছিল।

এই বেগ মনের অচিন্ত্য। এরূপ বেগে নিক্ষিপ্ত পদার্থ এক সেকেণ্ডে ভারতবর্ষ পার হইতে পারে—পাঁচ সেকেণ্ডে কলিকাতা হইতে বিলাত পহুঁছিতে পারে, এবং ২৪ সেকেণ্ডে, অর্থাৎ অর্দ্ধ মিনিটের কমে, পৃথিবী

বেষ্টন করিয়া আসিতে পারে।

আর এক বিচিত্র কথা আছে। আমরা যদি কোন মৃৎপিণ্ড ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করি, তাহা আবার ফিরিয়া আসিয়া পৃথিবীতে পড়ে। তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তির বলে, এবং বায়বীয় প্রতিবন্ধকতায়, ক্ষেপণীর বেগ ক্রমে বিনষ্ট হইয়া, যখন ক্ষেপণী একবারে বেগহীন হয়, তখন মাধ্যাকর্ষণের বলে পুনর্ব্বার তাহা ভূপতিত হয়। সূর্য্যলোকেও অবশ্য তাহাই হওয়া সম্ভব। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণী শক্তি বা বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার শক্তি কখন অসীম নহে। উভয়েরই সীমা আছে। অবশ্য এমত কোন বেগবতী গতি আছে যে তদ্দ্বারা উভয় শক্তিই পরাভূত হইতে পারে। এই সীমা কোথায়, তাহাও গণনা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। যে বস্তু নির্গম

কালে প্রতি সেকেণ্ডে ৩৮০ মাইল গমন করে, তাহা মাধ্যাকর্ষণী শক্তি এবং বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার বল অতিক্রম করিয়া যায়। অতএব উপরিবর্ণিত বেগবান্ উৎক্ষিপ্ত পদার্থ, আর সূর্য্যলোকে ফিরিয়া আইসে না। সুতরাং প্রফেসর ইয়ঙ্ যে সৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদুৎক্ষিপ্ত পদার্থ আর সূর্য্যলোকে ফিরে নাই। তাহা অনন্তকাল অনন্ত আকাশে বিচরণ কবিয়া, ধূমকেতু বা অন্য কোন খেচর রূপে পরিগণিত হইবে কি, কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে!

প্রাক্টর সাহেব সিদ্ধান্ত করেন যে, উৎক্ষিপ্ত বস্তু লক্ষ ক্রোশ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল বটে, কিন্তু অদৃশ্যভাবে যে তদধিক দূর ঊর্দ্ধগত হয় নাই, এমত নহে। যতক্ষণ উহা উত্তপ্ত এবং জ্বালাবিশিষ্ট ছিল, ততক্ষণ তাহা

দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, ক্রমে শীতল হইয়া অনুজ্জ্বল হইলে, আর তাহা দেখা যায় নাই। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, উহা সার্দ্ধ তিন লক্ষ মাইল উঠিয়াছিল। অতএব এই সৌরোৎপাতনিক্ষিপ্ত পদার্থ অদ্ভুত বটে—লক্ষ-যোজনব্যাপী, মনোগতি, এক নূতন সৃষ্টির আদি।

আকাশে কত তারা আছে?

ঐ যে নীল নৈশ নভোমণ্ডলে অসংখ্য বিন্দু জ্বলিতেছে, ও গুলি কি?

ও গুলি তারা। তারা কি? প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে পাঠশালার ছাত্র মাত্রেই তৎক্ষণাৎ বলিবে যে, তারা সব সূর্য্য। সব সূর্য্য! সূর্য্য ত দেখিতে পাই বিশ্বদাহকর, প্রচণ্ড কিরণমালার আকর; তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবারও মনুষ্যের শক্তি নাই; কিন্তু তারা সব ত

বিন্দু মাত্র; অধিকাংশ তারাই নয়নগোচর হইয়া উঠে না। এমন বিসদৃশের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলিব যে এ গুলি সূর্য্য? এ কথার উত্তর পাঠশালার ছাত্রের দেয় নহে। এবং যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করেন নাই, তাঁহারা এই কথাই অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিবেন। তাঁহাদিগকে আমরা এক্ষণে ইহাই বলিতে পারি যে, এ কথা অলঙ্ঘ্য প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে। সেই প্রমাণ কি, তাহা বিবৃত করা এস্থলে আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যার সম্যগ্ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই প্রমাণ এখানে বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা জ্যোতিষ সম্যগ্ অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহাদের

পক্ষে সেই প্রমাণ বোধগম্য করা অতি দুরূহ ব্যাপার। বিশেষ দুইটী কঠিন কথা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে; প্রথমতঃ কি প্রকারে নভঃস্থ জ্যোতিষ্কের দূরতা পরিমিত হয়; দ্বিতীয় আলোক পরীক্ষক নামক আশ্চর্য্য যন্ত্র কি প্রকার, এবং কি প্রকারে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং সে বিষয়ে অদ্য আমরা প্রবৃত্ত হইলাম না। অদ্য সন্দিহান পাঠকগণের প্রতি আমাদিগের অনুরোধ এই, তাঁহারা ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাস করিয়া বিবেচনা করুন যে, এই আলোকবিন্দু গুলিন সকলই সৌর প্রকৃত। কেবল আত্যন্তিক দূরতা বশতঃ আলোক বিন্দুবৎ দেখায়।

এখন কত সূর্য্য এই জগতে আছে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করাই অদ্য আমাদিগের উদ্দেশ্য। আমরা পরিষ্কার চন্দ্রবিযুক্তা নি-

শীতে নির্ম্মল নিরম্বুদ আকাশমণ্ডল প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া দেখিতে পাই যে, আকাশে নক্ষত্র যেন আর ধরে না। আমরা বলি, নক্ষত্র অসংখ্য। বাস্তবিক কি নক্ষত্র অসংখ্য! বাস্তবিক শুধু চক্ষে আমরা যে নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহা কি গণিয়া সংখ্যা করা যায় না?

ইহা অতি সহজ কথা। যে কেহ অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া স্থির চিত্তে গণিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই সফল হইবেন। বস্তুতঃ দূরবীক্ষণ ব্যতীত যে তারা গুলিন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অসংখ্য নহে—সংখ্যায় এমন অধিকও নহে। তবে তারা সকল যে অসংখ্য বোধ হয়, তাহা উহার দৃশ্যতঃ বিশৃঙ্খলতা জন্য মাত্র। যাহা শ্রেণীবদ্ধ এবং বিন্যস্ত, তাহার অপেক্ষা যাহা শ্রেণীবদ্ধ নহে এবং অবিন্যস্ত, তাহা সংখ্যায় অধিক বোধ হয়। তারা সকল

আকাশে শ্রেণীবদ্ধ এবং বিন্যস্ত নহে বলিয়াই আশু অসংখ্য বলিয়া বোধ হয়।

বস্তুতঃ যত তারা দূরবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কর্ত্তৃক পুনঃ২ গণিত হইয়াছে। বর্লিন নগরে যত তারা ঐ রূপে দেখা যায়, অর্গেলন্দর তাহার সংখ্যা করিয়া তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই তালিকায় ৩২৫৬টি মাত্র তারা আছে। পারিস নগর হইতে যত তারা দেখা যায়, হম্বোল্‌টের মতে তাহা ৪১৪৬টি মাত্র। গেলামির আকাশ মণ্ডল নামক গ্রন্থে চক্ষুর্দৃশ্য তারার যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই প্রকার;

১ম শ্রেণী	...	...	২০
২য় শ্রেণী	...	...	৬৫
৩য় শ্রেণী	...	...	২০০

৫ম শ্রেণী	...	...	১১০০
৬ষ্ঠ শ্রেণী	...	...	৩২০০
			৪৫৮৫

এই তালিকায় চতুর্থ শ্রেণীর তারার সংখ্যা নাই। তৎসমেত আন্দাজ ৫০০০ পাঁচ হাজার তারা শুধু চক্ষে দৃষ্ট হয়।

কিন্তু বিষুব রেখার যত নিকটে আসা যায়, তত অধিক তারা নয়নগোচর হয়। বর্লিন ও পারিস নগর হইতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, এ দেশে তাহার অধিক তারা দেখা যায়। কিন্তু এদেশেও ছয় সহস্রের অধিক দেখা যাওয়া সম্ভবপর নহে।

এক কালীন আকাশের অর্দ্ধাংশ ব্যতীত আমরা দেখিতে পাই না। অপরার্দ্ধ অধস্তলে থাকে। সুতরাং মুষ্যচক্ষে এককালীন যত

তারা দেখা যায়, তাহা তিন সহস্রের অধিক নহে।

এতক্ষণ আমরা কেবল শুধু চক্ষের কথা বলিতেছিলাম। যদি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আকাশ মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, তারা অসংখ্যই বটে। শুধু চোখে যেখানে দুই একটি মাত্র তারা দেখিয়াছি, দূরবীক্ষণে সেখানে সহস্র তারা দেখা যায়।

গেলামী এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য মিথুন রাশির একটি ক্ষুদ্রাংশের দুইটি চিত্র দিয়াছেন। ঐ স্থান বিনা দূরবীক্ষণে যেরূপ দেখা যায়, প্রথম চিত্রে তাহাই চিত্রিত আছে। তাহাতে পাঁচটি মাত্র নক্ষত্র দেখা যায়। দ্বিতীয় চিত্রে ইহা দূরবীক্ষণে যেরূপ দেখা যায়,

তাহাই অঙ্কিত হইয়াছে। তাহাতে পাঁচটি তারার স্থানে তিন সহস্র দুই শত পাঁচটি তারা দেখা যায়!

দূরবীক্ষণের দ্বারাই বা কত তারা মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহারও সংখ্যা ও তালিকা হইয়াছে। সুবিখ্যাত সর উইলিয়ম হর্শেল প্রথম এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি বহু-কালাবধি প্রতিরাত্রে আপন দূরবীক্ষণসমীপা-গত তারা সকল গণনা করিয়া তাহার তালিকা করিতেন। এইরূপে ৩৪০০ বার আকাশ পর্য্য-বেক্ষণের ফল তিনি প্রচার করেন। যতটা আকাশ চন্দ্র কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ আট শত গাগনিক খণ্ড মাত্র তিনি এই ৩৪০০ বারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাতে আকাশের ২৫০ ভাগের এক ভাগের অধিক হয় না। আকাশের এই ২৫০ ভাগের এক

ভাগ মাত্রে তিনি ৯০০০০ অর্থাৎ প্রায় এক লক্ষ তারা গণনা করিয়াছিলেন। স্ত্রূব নামা বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ গণনা করিয়াছেন যে, এই রূপে সমুদায় আকাশ মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তালিকা নিবদ্ধ করিতে অশীতি বৎসর লাগে।

তাহার পরে সর উইলিয়মের পুত্র সর্ জন হর্শেল ঐরূপ আকাশ সন্ধানে ব্রতী হয়েন। তিনি ২৩০০ বার আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আরও সপ্ততি সহস্র তারা সংখ্যা করিয়াছিলেন।

অর্গেলন্দর নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত তারা স্বীয় তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। তাহাতে সপ্তম শ্রেণীর ১৩০০০ তারা, অষ্টম শ্রেণীর ৪০০০০ তারা, এবং নবম শ্রেণীর ১৪২০০০ তারা। উচ্চতম শ্রেণীর সংখ্যা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এসকল সংখ্যাও সামান্য। আ-

কাশে পরিষ্কার রাত্রে এক স্থূল শ্বেত রেখা নদীর ন্যায় দেখা যায়। আমরা সচরাচর তাহাকে ছায়াপথ বলি। ঐ ছায়াপথ কেবল দৌরবীক্ষণিক নক্ষত্র সমষ্টি মাত্র। উহার অসীম দূরতাবশতঃ নক্ষত্র সকল দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তাহার আলোকসমবায়ে ছায়াপথ শ্বেতবর্ণ দেখায়। দূরবীক্ষণে উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাময় দেখায়। সর্ উইলিয়ম হর্শেল গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কেবল ছায়াপথ মধ্যে ১৮,০০০,০০০ এক কোটি আশি লক্ষ তারা আছে।

স্ত্রূব গণনা করেন যে, সমগ্র আকাশ মণ্ডলে দুইকোটি নক্ষত্র আছে।

মসূর শাকোর্ণাক্ বলেন, "সর উইলিয়ম হর্শেলের আকাশ সন্ধান এবং রাশিচক্রের চিত্রাদি দেখিয়া, বেসেলের কৃত কটিবন্ধ সক-

লের তালিকার ভূমিকাতে যেরূপ গড়পড়তা করা আছে, তৎসম্বন্ধে উইসের কৃত নিয়মাবলম্বন করিয়া আমি ইহা গণনা করিয়াছি যে, সমুদায় আকাশে সাত কোটি সত্তর লক্ষ নক্ষত্র আছে।”

এই সকল সংখ্যা শুনিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। যেখানে আকাশে তিন হাজার নক্ষত্র দেখিয়া আমরা অসংখ্য নক্ষত্র বিবেচনা করি, সেখানে সাত কোটি সপ্ততি লক্ষের কথা দূরে থাক, দুই কোটিই কি ভয়ানক ব্যাপার।

কিন্তু ইহাতে আকাশের নক্ষত্র সংখ্যার শেষ হইল না। দূরবীক্ষণের সাহায্যে গগনাভ্যন্তরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ধূম্রাকার পদার্থ দৃষ্ট হয়। উহাদিগকে নীহারিকা নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যে সকল দূরবীক্ষণ অত্যন্ত শক্তিশালী, তাহার সাহায্যে এক্ষণে দেখা গিয়াছে

যে বহু সংখ্যক নীহারিকা কেবল নক্ষত্র পুঞ্জ। অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন, যে সকল নক্ষত্র আমরা শুধু চক্ষে বা দূরবীক্ষণ দ্বারা গগনে বিকীর্ণ দেখিতে পাই, তৎসমুদায় একটিমাত্র নাক্ষত্রিক জগৎ। অসংখ্য নক্ষত্রময় ছায়াপথ এই নাক্ষত্রিক বিশ্বের অন্তর্গত। এমন অন্যান্য নাক্ষত্রিক জগৎ আছে। এই সকল দূর-দৃষ্ট তারাপুঞ্জময়ী নীহারিকা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাক্ষত্রিক জগৎ। সমুদ্রতীরে যেমন বালি, বনে যেমন পাতা, মালার রাশিতে যেমন ফুল, এক একটি নীহারিকাতে নক্ষত্র রাশি তেমনি অসংখ্য এবং ঘনবিন্যস্ত। এই সকল নীহারিকান্তর্গত নক্ষত্র সংখ্যা ধরিলে সাত কোটি সত্তর লক্ষ কোথায় ভাসিয়া যায়! কোটি কোটি নক্ষত্র আকাশ মণ্ডলে বিচরণ করিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার

ভাবিতে ভাবিতে মনুষ্য বুদ্ধি চিন্তায় অশক্ত হইয়া উঠে। চিত্ত বিস্ময়বিহ্বল হইয়া যায়। সর্ব্বত্রগামিনী মনুষ্যবুদ্ধিরও গমনসীমা দেখিয়া চিত্ত নিরস্ত হয়।

এই কোটি কোটি নক্ষত্র সকলই সূর্য্য। আমরা যে এক সূর্য্যকে সূর্য্য বলি, সে কত বড় প্রকাণ্ড বস্তু, তাহা সৌরবিপ্লব সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পৃথিবী অপেক্ষা ত্রয়োদশ লক্ষ গুণ বৃহৎ। নাক্ষত্রিক জগৎ মধ্যস্থ অনেক গুলি নক্ষত্র যে এ সূর্য্যাপেক্ষাও বৃহৎ, তাহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে। এমন কি, সিরিয়স (Sirius) নামে নক্ষত্র এই সূর্য্যের ২৬৬৮ গুণ বৃহৎ, ইহা স্থির হইয়াছে। কোন কোন নক্ষত্র যে এ সূর্য্যাপেক্ষা আকারে কিছু ক্ষুদ্রতর, তাহাও গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে। এইরূপ ছোট বড় মহাভয়ঙ্কর আকারবিশিষ্ট,

মহাভয়ঙ্কর তেজোময় কোটি কোটি সূর্য্য অনন্ত আকাশে বিচরণ করিতেছে। যেমন আমাদিগের সৌরজগতের মধ্যবর্ত্তী সূর্য্যকে ঘেরিয়া গ্রহ উপগ্রহাদি বিচরণ করিতেছে, তেমনি ঐ সকল সূর্য্যপার্শ্বে গ্রহ উপগ্রহাদি ভ্রমিতেছে, সন্দেহ নাই। তবে জগতে জগতে কত কোটি কোটি সূর্য্য, কত কোটি কোটি কোটী পৃথিবী, তাহা কে ভাবিয়া উঠিতে পারে! এ আশ্চর্য্য কথা কে বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারে? যেমন পৃথিবীর মধ্যে এক কণা বালুকা, জগৎ মধ্যে এই সসাগরা পৃথিবী তদপেক্ষাও সামান্য, রেণুমাত্র,—বালুকার বালুকাও নহে। তদুপরি মনুষ্য কি সামান্য জীব! এ কথা ভাবিয়া কে আর আপন মনুষ্যত্ব লইয়া গর্ব্ব করিবে?

ধূলা।

ধূলার মত সামান্য পদার্থ আর সংসারে নাই। কিন্তু আচার্য্য টিণ্ডল ধূলা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আচার্য্যের ঐ প্রবন্ধটি দীর্ঘ এবং দুরূহ, তাহা সংক্ষেপে এবং সহজে বুঝান অতি কঠিন কর্ম্ম। আমরা কেবল টিণ্ডল সাহেব কৃত সিদ্ধান্ত গুলিই এ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিব, যিনি তাঁহার প্রমাণ জিজ্ঞাসু হইবেন, তাঁহাকে আচার্য্যের প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে।

১। ধূলা, এই পৃথিবীতলে এক প্রকার সর্ব্বব্যাপী। আমরা যাহা যত পরিষ্কার করিয়া রাখি না কেন, তাহা মুহূর্ত্ত জন্য ধূলা ছাড়া নহে। যত "বাবুগিরি" করি না কেন, কিছুতেই ধূলা হইতে নিষ্কৃতি নাই। যে বায়ু অত্যন্ত পরি-

ষ্কার বিবেচনা করি, তাহাও ধূলায় পূর্ণ। সচরাচর ছায়ামধ্যে কোন রন্ধ্রনিপতিত রৌদ্রে দেখিতে পাই যে, যে বায়ু পরিষ্কার দেখাইতেছিল, তাহাতেও ধূলা চিক্ চিক্ করিতেছে। সচরাচর বায়ু যে এরূপ ধূলাপূর্ণ, তাহা জানিবার জন্য আচার্য্য টিণ্ডলের উপদেশের আবশ্যক নাই, সকলেই তাহা জানে। কিন্তু বায়ু ছাঁকা যায়। আচার্য্য বহুবিধ উপায়ের দ্বারা বায়ু অতি পরিপাটি করিয়া ছাঁকিয়া দেখিয়াছেন। তিনি অনেক চোঙ্গার ভিতর দ্রাবকাদি পূরিয়া তাহার ভিতর দিয়া বায়ু ছাঁকিয়া লইয়া গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাও ধূলায় পরিপূর্ণ। এইরূপ ধূলা অদৃশ্য, কেন না তাহার কণা সকল অতি ক্ষুদ্র। রৌদ্রেও উহা অদৃশ্য। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাও অদৃশ্য, কিন্তু বৈদ্যুতিক প্রদীপের আলোক রৌ-

দ্রাপেক্ষাও উজ্জ্বল। উহার আলোক ঐ ছাঁকা বায়ুর মধ্যে প্রেরণ করিয়া তিনি দেখিয়াছেন যে, তাহাতেও ধূলা চিক্‌চিক্ করিতেছে। যদি এত যত্নপরিষ্কৃত বায়ুতেও ধূলা, তবে সচরাচর ধনী লোকে যে ধূলা নিবারণ করিবার উপায় করেন, তাহাতে ধূলা নিবারণ হয় না, ইহা বলা বাহুল্য। ছায়ামধ্যে রৌদ্র না পড়িলে রৌদ্রে ধূলা দেখা যায় না, কিন্তু রৌদ্র মধ্যে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে রেখা প্রেরণ করিলে ঐ ধূলা দেখা যায়। অতএব আমরা যে বায়ু মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নিশ্বাসে গ্রহণ করিতেছি, তাহা ধূলিপূর্ণ। যাহা কিছু ভোজন করি, তাহা ধূলিপূর্ণ, কেন না বায়ুস্থিত ধূলিরাশি দিবারাত্র সকল পদার্থের উপর বর্ষণ হইতেছে। আমরা যে কোন জল পরিষ্কৃত করি না কেন, উহা ধূলিপূর্ণ। কলিকাতার

জল পলতার কলে পরিষ্কৃত হইতেছে বলিয়া তাহা ধূলিশূন্য নহে। ছাঁকিলে ধূলা যায় না।

২। এই ধূলা বাস্তবিক সমুদয়াংশই ধূলা নহে। তাহার অনেকাংশ জৈব পদার্থ। যে সকল অদৃশ্য ধূলি কণার কথা উপরে বলা গেল, তাহার অধিক ভাগ ক্ষুদ্র২ জীব। যে ভাগ জৈব নহে, তাহা অধিকতর গুরুত্ব বিশিষ্ট; এজন্য তাহা বায়ুপরি তত ভাসিয়া বেড়ায় না। অতএব আমরা প্রতি নিশ্বাসে শত২ ক্ষুদ্র২ জীব দেহ মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি; জলের সঙ্গে সহস্র২ পান করি; রাক্ষসবৎ অনেককে আহার করি। লণ্ডনের আটটি কোম্পানির কলে ছাঁকা পানীয় জল টিণ্ডল সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন তিনি আর অনেক প্রকার জল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত

করিয়াছেন যে, জল সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা মনুষ্য সাধ্যাতীত। যে জল স্ফাটিক পাত্রে রাখিলে বৃহৎ হীরক খণ্ডের ন্যায় স্বচ্ছ বোধ হয়, তাহাও সমল, কীটাণুপূর্ণ। জৈনেরা এ কথা স্মরণ রাখিবেন।

৩। এই সর্ব্বব্যাপিধূলিকণা সংক্রামক পীড়ার মূল। অনতি পূর্ব্বে সর্ব্বত্র এই মত প্রচলিত ছিল যে, কোন এক প্রকার পচনশীল নির্জ্জীব জৈব পদার্থ (Malaria) কর্ত্তৃক সংক্রামক পীড়ার বিস্তার হইয়া থাকে। এ মত ভারতবর্ষে অদ্যাপি প্রবল। ইউরোপে এ বিশ্বাস একপ্রকার উচ্ছিন্ন হইতেছে। আচার্য্য টিণ্ডল প্রভৃতির বিশ্বাস এই যে, সংক্রামক পীড়ার বিস্তারের কারণ সজীব পীড়াবীজ (Germ)। ঐ সকল পীড়াবীজ বায়ুতে এবং জলে ভাসিতে থাকে; এবং শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট

হইয়া তথায় জীবজনক হয়। জীবের শরীর মধ্যে অসংখ্য জীবের আবাস। কেশে উৎকুণ, উদরে কৃমি, ক্ষতে কীট, এই কয়টী মনুষ্য শরীরে সাধারণ উদাহরণ। পশু মাত্রেরই গাত্র মধ্যে কীট সমূহের আবাস। জীবতত্ত্ববিদেরা অবধারিত করিয়াছেন যে, ভূমে, জলে, বা বায়ুতে যত জাতীয় জীব আছে, তদপেক্ষা অধিক জাতীয় জীব অন্য জীবের শরীরবাসী। যাহাকে উপরে "পীড়াবীজ" বলা হইয়াছে তাহাও জীবশরীরবাসী জীব বা জীবোৎপাদক বীজ। শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তদুৎপাদ্য জীবের জন্ম হইতে থাকে। এই সকল শোণিতনিবাসী জীবের জনকতা শক্তি অতি ভয়ানক। যাহার শরীরমধ্যে ঐ প্রকার পীড়াবীজ প্রবিষ্ট হয়, সে সংক্রামক পীড়াগ্রস্ত হয়। ভিন্ন২ পীড়ার ভিন্ন২ বীজ। সংক্রামক জ্বরের

বীজে জ্বর উৎপন্ন হয়; বসন্তের বীজে বসন্ত জন্মে; ওলাউঠার বীজে ওলাউঠা; ইত্যাদি।

৪। পীড়াবীজে কেবল সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হয়, এমত নহে। ক্ষতাদি যে শুকায় না, ক্রমে পচে, দুর্গন্ধ হয়, দুরারোগ্য হয়, ইহাও অনেক সময়ে এই সকল ধূলিকণা রূপী পীড়াবীজের জন্য। ক্ষতমুখ কখনই এমত আচ্ছন্ন রাখা যাইতে পারে না, যে অদৃশ্য ধূলা তাহাতে লাগিবে না। নিতান্ত পক্ষে তাহা ডাক্তারের অস্ত্র মুখে ক্ষতমধ্যে প্রবেশ করিবে। ডাক্তার যতই অস্ত্র পরিষ্কার রাখুন না কেন, অদৃশ্য ধূলিপুঞ্জের কিছুতেই নিবারণ হয় না। কিন্তু ইহার একটী সুন্দর উপায় আছে। ডাক্তারেরা প্রায় তাহা অবলম্বন করেন। কার্ব্বণিক আসিড নামক দ্রাবক বীজঘাতী; তাহা জল মিশাইয়া ক্ষত মুখে বর্ষণ করিতে

থাকিলে প্রবিষ্ট বীজ সকল মরিয়া যায়। ক্ষতমুখে পরিষ্কৃত তুলা বাঁধিয়া রাখিলেও অনেক উপকার হয়, কেন না তুলা বায়ু পরিষ্কৃত করিবার একটী উৎকৃষ্ট উপায়।

গগন পর্য্যটন।

পুরাণ ইতিহাসাদিতে কথিত আছে পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজগণ আকাশ মার্গে রথ চালাইতেন। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহারা সচরাচর এ পাড়া ও পাড়ার ন্যায়, স্বর্গলোকে বেড়াইতে যাইতেন, কথায় কথায় সমুদ্রকে গণ্ডূষ করিয়া ফেলিতেন; কেহ জগদীশ্বরকে অভিশপ্ত করিতেন, কেহ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতেন। প্রাচীন

ভারতবর্ষীয়দিগের কথা স্বতন্ত্র ; সামান্য মনুষ্য-দিগের কথা বলা যাউক।

সামান্য মনুষ্যের চিরকাল বড় সাধ গগন পর্য্যটন করে। কথিত আছে, তারন্তম নগর-বাসী আর্কাইতস নামক এক ব্যক্তি ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে একটি কাষ্ঠের পক্ষী প্রস্তুত করিয়াছিল ; তাহা কিয়ৎক্ষণ জন্য আকাশে উঠিতে পারিয়াছিল। ৬৬খ্রীষ্টাব্দে, সাইমন নামক এক ব্যক্তি রোম নগরে প্রাসাদ হইতে প্রাসাদে উড়িয়া বেড়াইবার উদ্যোগ পাইয়াছিল। এবং তৎপরে কনস্তান্তিনোপল নগরে একজন মুসলমান ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে. দান্তে নামক একজন গণিতশাস্ত্র-বিৎ পক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া আপন অঙ্গে সমাবেশ করিয়া থ্রাসিমীন হ্রদের উপর উঠিয়া গগনমার্গে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঐরূপ

করিতে করিতে এক দিন এক উচ্চ অট্টালিকার উপর পড়িয়া তাঁহার পদ ভঙ্গ হয়। মাম্স্বরি নিবাসী অলিবর নামক একজন ইংরেজেরও সেই দশা ঘটে। ১৬৩৮ শালে গোল্ড উইন নামক একব্যক্তি শিক্ষিত হংসদিগের সাহায্যে উড়িতে চেষ্টা করেন। ১৬৭৮ শালে বেনিয়র নামক একজন ফরাশী পক্ষ প্রস্তুত পূর্ব্বক হস্ত পদে বাঁধিয়া উড়িয়াছিল। ১৭১০ শালে লরেন্ত দে গুজ্মান নামক একজন ফরাসি দারুনির্ম্মিত বায়ুপূর্ণ পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আকাশে উঠিয়াছিল। মার্কুইস্ দে বাকবিল নামক একজন আপন অট্টালিকা হইতে উড়িতে চেষ্টা করিয়া নদীগর্ত্তে পতিত হন। বানসার্ডেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল।

১৭৬৭ শালে বিখ্যাত রসায়ন বিদ্যার আচার্য্য ডাক্তার বাক প্রচার করেন যে জল-

জন বায়ু পরিপূর্ণ পাত্র আকাশে উঠিতে পারে। আচার্য্য কারালো ইহা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণী-কৃত করেন, কিন্তু তখনও ব্যোমযানের কল্পনা হয় নাই।

ব্যোমযানের সৃষ্টিকর্ত্তা মোনগোলফীর নামক ফরাশী। কিন্তু তিনি জলজন বায়ুর সাহায্য অবলম্বন করেন নাই। তিনি প্রথমে কাগজের বা বস্ত্রের গোলক নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে উত্তপ্ত বায়ু পূরিতেন। উত্তপ্ত হইলে বায়ু লঘুতর হয়, সুতরাং তৎসাহায্যে গোলক সকল ঊর্দ্ধে উঠিত। আচার্য্য চার্লস প্রথমে জলজন বায়ুপূরিত ব্যোমযানের সৃষ্টি করেন। গ্লোব নামক ব্যোমযানে উক্ত বায়ু পূর্ণ করিয়া প্রেরণ করেন; তাহাতে সাহস করিয়া কোন মনুষ্য আরোহণ করে নাই। রাজপুরুষেরাও প্রাণিহত্যার ভয় প্রযুক্ত কাহাকেও আরোহণ

করিতে দেন নাই। এই ব্যোমযান কিয়দ্দূর উঠিয়া ফাটিয়া যায়, জলজন বাহির হইয়া যাওয়ায়, ব্যোমযান তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হয়। গোনেস নামক ক্ষুদ্র গ্রামে উহা পতিত হয়। অদৃষ্টপূর্ব্ব খেচর দেখিয়া গ্রাম্য লোকে ভীত হইয়া, মহা কোলাহল আরম্ভ করে।

অনেকে একত্রিত হইয়া গ্রাম্য লোকেরা দেখিতে আইল যে, কিরূপ জন্তু আকাশ হইতে নামিয়াছে। দুই জন ধর্ম্মযাজক বলিলেন, যে ইহা কোন অলৌকিক জীবের দেহাবশিষ্ট চর্ম্ম। শুনিয়া গ্রামবাসিগণ তাহাতে ঢিল মারিতে আরম্ভ করিল, এবং খোঁচা দিতে লাগিল। তন্মধ্যে ভূত আছে, বিবেচনা করিয়া, গ্রাম্য লোকেরা ভূত শান্তির জন্য দলবদ্ধ হইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল, পরিশেষে মন্ত্রবলে ভূত ছাড়িয়া পলায়

কিনা, দেখিবার জন্য আবার ধীরে ধীরে সেই-
খানে ফিরিয়া আসিল। ভুত তথাপি যায়
না—বায়ু সংস্পর্শে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করে।
পরে একজন গ্রাম্যবীর, সাহস করিয়া তৎ-
প্রতি বন্দুক ছাড়িল। তাহাতে ব্যোমযানের
আবরণ ছিদ্রবিশিষ্ট হওয়াতে, বায়ু বাহির
হইয়া, রাক্ষসের শরীর আরও শীর্ণ হইল।
দেখিয়া সাহস পাইয়া, আর একজন বীর গিয়া
তাহাতে অস্ত্রাঘাত করিল। তখন ক্ষত মুখ
দিয়া বহুল পরিমাণে জলজন নির্গত হওয়ায়,
বীরগণ তাহার দুর্গন্ধে ভয় পাইয়া রণে ভঙ্গ
দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু এজাতীয় রাক্ষ-
সের শোণিত ঐ বায়ু। তাহা ক্ষতমুখে নির্গত
হইয়া গেলে, রাক্ষস ছিন্নমুণ্ড ছাগের ন্যায়
"ধড় ফড়" করিয়া মরিয়া গেল। তখন বীর-
গণ প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাকে অশ্বপুচ্ছে বন্ধন

পূর্ব্বক লইয়া গেলেন। এদেশে হইলে সঙ্গে২ একটি রক্ষাকালী পূজা হইত, এবং ব্রাহ্মণেরা চণ্ডীপাঠ করিয়া কিছু লাভ করিতেন। তার পরে, মোনগোল্‌ফীর আবার আগ্নেয় ব্যোমযান(অর্থাৎ যাহাতে জলজন না পূরিয়া, উত্তপ্ত সামান্য বায়ুপূরিত হয়) বর্ষেল হইতে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে আধুনিক বেলুনের ন্যায় একখানি "রথ" সংযোজন করিয়া দেওয়া হইয়া ছিল। কিন্তু সেবারও মনুষ্য উঠিল না। সেই রথে চড়িয়া একটি মেষ, একটি কুক্কুট, ও একটি হংস স্বর্গ পরিভ্রমণে গমন করিয়াছিল। পরে স্বচ্ছন্দে গগন বিহার করিয়া, তাহারা স্বশরীরে মর্ত্য ধামে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহারা পুণ্যবান্ সন্দেহ নাই।

এক্ষণে ব্যোমযানে মনুষ্য উঠিবার প্রস্তাব

হইতে লাগিল। কিন্তু প্রাণিহত্যার আশঙ্কায় ফ্রান্সের অধিপতি, তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে, যদি ব্যোম যানে মনুষ্য উঠে, তবে যাহারা বিচারালয়ে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাধীন হইয়াছে, এমত দুই ব্যক্তি উঠুক—মরে মরিবে। শুনিয়া পিলা-তর দে রোজীর নামক একজন বৈজ্ঞানিকের বড় রাগ হইল—"কি! আকাশ মার্গে প্রথম ভ্রমণ করার যে গৌরব, তাহা দুর্ব্বৃত্ত নরাধম দিগের কপালে ঘটিবে!" একজন রাজপুরস্ত্রীর সাহায্যে রাজার মত ফিরাইয়া তিনি মার্কুইস দার্লান্দের সমভিব্যাহারে ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া আকাশ পথে পর্য্যটন করেন। সে বার নির্ব্বিঘ্নে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছি-লেন, কিন্তু তাহার দুই বৎসর পরে—আবার ব্যোমযানে আরোহণ পূর্ব্বক, সমুদ্র পার হ-

ইতে গিয়া, অধঃপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। যাহাহউক, তিনিই মনুষ্য মধ্যে প্রথম গগনপর্য্যটক। কেন না, দুষ্মন্ত পুরুরবা, কৃষ্ণার্জ্জুন প্রভৃতিকে মনুষ্য বিবেচনা করা, অতি ধৃষ্টের কাজ! আর যিনি জয় রাম বলিয়া পঞ্চমবায়ুপথে সমুদ্র পার হইয়াছিলেন, তিনিও মনুষ্য নহেন, নচেৎ তাঁহাকে এই পদে অভিষিক্ত করার আমাদিগের আপত্তি ছিল না।

দে রোজীরের পরেই চার্ল স্ ও রবর্ট একত্রে, রাজভবন হইতে, ছয় লক্ষ দর্শকের সমক্ষে জলজনীয় ব্যোমযানে উড্ডীন হয়েন। এবং প্রায় ১৪০০০ ফীট ঊর্দ্ধে উঠেন।

ইহার পরে ব্যোমযানারোহণ বড় সচরাচর ঘটিতে লাগিল। কিন্তু অধিকাংশই আমোদের জন্য। বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব পরীক্ষার্থ যাঁহারা আকাশ পথে বিচরণ করিয়াছেন, ত-

মধ্যে ১৮০৪ শালে গাই লুসাকের আরোহণই বিশেষ বিখ্যাত। তিনি একাকী ২৩০০০ ফিট ঊর্দ্ধে উঠিয়া নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছিলেন। ১৮৩৬ শালে গ্রীন এবং হলণ্ড সাহেব, পনের দিবসের খাদ্যাদি বেলুনে তুলিয়া লইয়া, ইংলণ্ড হইতে গগনারোহণ করেন। তাঁহারা সমুদ্র পার হইয়া, আঠার ঘণ্টার মধ্যে জর্ম্মাণীর অন্তর্গত উইলবর্গ নামক নগরের নিকট অবতরণ করেন। গ্রীন অতি প্রসিদ্ধ গগন পর্য্যটক ছিলেন। তিনি প্রায় চতুর্দ্দশ শত বার গগনারোহণ করিয়াছিলেন। তিনবার, বায়ুপথে সমুদ্র পার হইয়াছিলেন—অতএব, কলিযুগেও রামায়ণের দৈববলসম্পন্ন কার্য্য সকল পুনঃসম্পাদিত হইতেছে। গ্রীন, দুইবার সমুদ্র মধ্যে পতিত হয়েন—এবং কৌশলে প্রাণরক্ষা করেন।

কিন্তু বোধ হয় জেম্‌স্‌গ্লেশর অপেক্ষা কেহ অধিক ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। তিনি ১৮৬২ শালে উল্বর্হাম্‌টন হইতে উড্‌ডীন হ-ইয়া প্রায় সাত মাইল ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। তিনি বহুশতবার গগনোপরি ভ্রমণপূর্ব্বক, বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পরীক্ষা করিয়াছি-লেন। সম্প্রতি আমেরিকার গগনপর্য্যটক ওয়াইজ সাহেব, ব্যোমযানে আমেরিকা হইতে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া ইউরোপে আসিবার কল্পনায়, তাঁহার যথাযোগ্য উদ্যোগ করিয়া, যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু সমুদ্রো-পরি আসিবার পূর্ব্বে বাত্যামধ্যে পতিত হ-ইয়া অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সাহস অতি ভয়ানক !

পাঠকদিগের অদৃষ্টে সহসা যে গগনপর্য্য-টন সুখ ঘটিবে, এমত বোধ হয় না, এজন্য

গগনপর্য্যটকেরা আকাশে উঠিয়া কিরূপ দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের প্রণীত পুস্তকাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া এস্থলে সন্নিবেশ করিলে বোধ হয়, পাঠকেরা অসন্তুষ্ট হইবেন না। সমুদ্র নামটি কেবল জল সমুদ্রের প্রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু যে বায়ু কর্ত্তৃক পৃথিবী পরিবেষ্টিত তাহাও সমুদ্র বিশেষ; জলসমুদ্র হইতে ইহা বৃহত্তর। আমরা এই বায়বীয় সমুদ্রের তলচর জীব। ইহাতেও মেঘের উপদ্বীপ, বায়ুর স্রোতঃ প্রভৃতি আছে। তদ্বিষয়ে কিছু জানিলে ক্ষতি নাই।

ব্যোমযান অল্প উচ্চ গিয়াই মেঘ সকল বিদীর্ণ করিয়া উঠে। মেঘের আবরণে পৃথিবী দেখা যায় না, অথবা কদাচিৎ দেখা যায়। পদতলে অচ্ছিন্ন, অনন্ত দ্বিতীয় বসুন্ধরাবৎ মেঘজাল বিস্তৃত। এই বাষ্পীয় আবরণে

ভূগোলক আবৃত; যদি গ্রহান্তরে জ্ঞানবান্ জীব থাকে, তবে তাহারা পৃথিবীর বাষ্পীয়াবরণই দেখিতে পায়; পৃথিবী তাহাদিগের প্রায় অদৃশ্য। তদ্রূপ আমরাও বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণের রৌদ্রপ্রদীপ্ত, রৌদ্রপ্রতিঘাতী, বাষ্পীয় আবরণই দেখিতে পাই। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের এইরূপ অনুমান।

এইরূপ, পৃথিবী হইতে সম্বন্ধরহিত হইয়া, মেঘময় জগতের উপরে স্থিত হইয়া দেখা যায়, যে সর্ব্বত্র, জীবশূন্য, শব্দশূন্য, গতিশূন্য, স্থির, নীরব। মস্তকোপরে, আকাশ অতি নিবিড় নীল—সে নীলিমা আশ্চর্য্য। আকাশ বস্তুতঃ চিরান্ধকার—উহার বর্ণ গভীর কৃষ্ণ। অমাবশ্যার রাত্রে প্রদীপশূন্য গৃহমধ্যে সকল দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া থাকিলে যেরূপ অন্ধকার দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশের প্র-

কৃত বর্ণ তাহাই। তন্মধ্যে, স্থানে স্থানে নক্ষত্র সকল, প্রচণ্ড জ্বালা বিশিষ্ট। কিন্তু তদালোকে অনন্ত আকাশের অনন্ত অন্ধকার বিনষ্ট হয় না—কেন না এই সকল প্রদীপ বহুদূরস্থিত। তবে যে আমরা আকাশকে অন্ধকারময় না দেখিয়া উজ্জ্বল দেখি, তাহার কারণ বায়ু। সকলেই জানেন সূর্য্যালোক সপ্তবর্ণময়। স্ফটিকের দ্বারা বর্ণগুলি পৃথক্ করা যায়—সপ্ত বর্ণের সংমিশ্রণে সূর্য্যালোক। বায়ু জড় পদার্থ কিন্তু বায়ু আলোকের পথ রোধ করে না। বায়ু, সূর্য্যালোকের অন্যান্য বর্ণের পথ ছাড়িয়া দেয় কিন্তু নীলবর্ণকে রুদ্ধ করে। রুদ্ধ বর্ণ, বায়ু হইতে প্রতিহত হয়। সেই সকল প্রতিহত বর্ণাত্মক আলোক রেখা আমাদের চক্ষুতে প্রবেশ করায়, আকাশ উজ্জ্বল নীলিমাবিশিষ্ট দেখি—অন্ধকার দেখি

না।* কিন্তু যত ঊর্দ্ধে উঠা যায়, বায়ুস্তর তত-ক্ষীণতর হয়, গাগনিক উজ্জ্বল নীলবর্ণ ক্ষীণ-তর হয়; আকাশের কৃষ্ণত্ব কিছু কিছু সেই আবরণ ভেদ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য ঊর্দ্ধলোকে গাঢ় নীলিমা।

শিরে এই গাঢ় নীলিমা—পদতলে, তুঙ্গ শৃঙ্গ বিশিষ্ট পর্ব্বত মালায় শোভিত মেঘলোক —সে পর্ব্বত মালাও বাষ্পীয়—মেঘের পর্ব্বত —পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, তদুপরি আরও পর্ব্বত—কেহবা কৃষ্ণমধ্য, পার্শ্বদেশ রৌদ্রের প্রভাবিশিষ্ট—কেহবা রৌদ্রস্নাত, কেহ যেন শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত, কেহ যেন হীরক নির্ম্মিত। এই সকল মেঘের মধ্যদিয়া ব্যোমযান চলে।

---

* কেহ কেহ বলেন যে বায়ুমধ্যস্থ জল বাষ্প হইতে প্রতিহত নীল রশ্মি রেখাই আকাশের উজ্জ্বল নীলিমার কারণ।

তখন, নীচে মেঘ, উপরে মেঘ, দক্ষিণে মেঘ, বামে মেঘ, সম্মুখে মেঘ, পশ্চাতে মেঘ। কোথাও বিদ্যুৎ চমকিতেছে, কোথাও ঝড় বহিতেছে, কোথাও বৃষ্টি হইতেছে, কোথাও বরফ পড়িতেছে। মসূর ফন্ বিল একবার একটি মেঘগর্ব্ভস্থ রন্ধ্র দিয়া ব্যোমযানে গমন করিয়াছিলেন; তাঁহার কৃত বর্ণনা পাঠ করিয়া বোধ হয় যেমন মুঙ্গেরের পথে পর্ব্বতমধ্যদিয়া, বাষ্পীয় শকট গমন করে, তাঁহার ব্যোমযান মেঘ মধ্য দিয়া সেইরূপ পথে গমন করিয়াছিল।

এই মেঘলোকে সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য—ভূলোকে তাহার সাদৃশ্য অনুমিত হয় না। ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া অনেকে একদিনে দুইবার সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছেন। এবং কেহ কেহ একদিনে দুইবার

সূর্য্যোদয় দেখিয়াছেন। একবার সূর্য্যাস্তের পর রাত্রি সমাগম দেখিয়া আবার ততোধিক ঊর্দ্ধে উঠিলে দ্বিতীয়বার সূর্য্যাস্ত দেখা যাইবে। এবং একবার সূর্য্যোদয় দেখিয়া আবার নিম্নে নামিলে সেই দিন দ্বিতীয় সূর্য্যোদয় অবশ্য দেখা যাইবে।

ব্যোমযান হইতে যখন পৃথিবী দেখা যায় তখন উহা বিস্তৃত মানচিত্রের ন্যায় দেখায়; সর্ব্বত্র সমতল—অট্টালিকা, বৃক্ষ, উচ্চভূমি, এবং অল্পোন্নত মেঘও, যেন সকলই অনুচ্চ, সকলই সমতল, ভূমিতে চিত্রিতবৎ দেখায়। নগর সকল যেন ক্ষুদ্র২ গঠিত প্রতিকৃতি, চলিয়া যাইতেছে বোধ হয়। বৃহৎ জনপদ উদ্যানের মত দেখায়। নদী শ্বেত সূত্র বা উরগের মত দেখায়। বৃহৎ অর্ণবযান সকল বালকের ক্রীড়ার জন্য নির্ম্মিত তরণীর মত

দেখায়। যাঁহারা লণ্ডন বা পারিস্ নগরীর উপর উত্থান করিয়াছেন, তাঁহারা দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন,—তাঁহারা প্রশংসা করিয়া ফুরাইতে পারেন নাই। গ্লেশর সাহেব লিখিয়াছিলেন যে তিনি লণ্ডনের উপরে উঠিয়া এককালে ত্রিশলক্ষ মনুষ্যের বাসগৃহ নয়নগোচর করিয়াছিলেন। রাত্রিকালে মহানগরী সকলের রাজপথস্থ দীপমালা সকল অতি রমণীয় দেখায়।

যাঁহারা পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে যত ঊর্দ্ধে উঠা যায়, তত তাপের অল্পতা। শিমলা দারজিলিং প্রভৃতি পার্ব্বত্য স্থানের শীতলতার কারণ এই, এবং এইজন্য হিমালয় তুষার মণ্ডিত। (আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে হিমকে ভারতবর্ষীয় কবি "একোহি দোষোগুণসন্নিপাতে" বিবেচনা করিয়া-

ছিলেন, আধুনিক রাজপুরুষেরা, তাহাকেও গুণ বিবেচনা করিয়া তথায় রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছেন।) ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থান করিলেও ঐরূপ ক্রমে হিমের আতিশয্য অনুভূত হয়। তাপ, তাপমান যন্ত্রের দ্বারা মিত হইয়া থাকে। যন্ত্র ভাগে ভাগে বিভক্ত। মনুষ্য শোণিত কিছু উষ্ণ, তাহার পরিমাণ ৯৮ ভাগ। ২১২ ভাগ তাপে জল বাস্প হয়। ৩২ ভাগ তাপে জল তুষারত্ব প্রাপ্ত (তাপে জল তুষার হয় এ কোন কথা? বাস্তবিক তাপে জল তুষার হয় না, তাপাভাবেই হয়। ৩২ ভাগ তাপ জলের স্বাভাবিক তাপের অভাব বাচক।)

পূর্ব্বে বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সংস্কার ছিল যে ঊর্দ্ধে তিনশত ফিট প্রতি এক ভাগ তাপ কমে। অর্থাৎ তিনশত ফিট উঠিলে এক

ভাগ তাপহানি হইবে—ছয়শত ফিট উঠিলে দুই ভাগ তাপ কমিবে—ইত্যাদি। কিন্তু গ্লেশর সাহেব বহুবার পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ঊর্দ্ধে তাপহানি এরূপ একটি সরল নিয়মানুগামী নহে। অবস্থা বিশেষে তাপহানির লাঘব গৌরব ঘটিয়া থাকে। মেঘ থাকিলে, তাপহানি অল্প হয়—কারণ, মেঘ তাপরোধক এবং তাপগ্রাহক। আবার দিবাভাগে যেরূপ তাপহানি ঘটে, রাত্রে সেরূপ নহে। গ্লেশর সাহেবের পরীক্ষার ফল নিম্নলিখিত মত—

ভূমি হইতে হাজার ফিট পর্য্যন্ত মেঘাচ্ছন্নাবস্থায় তাপহানির পরিমাণ ৪·৫ ভাগ; মেঘ না থাকিলে ৬·২ ভাগ, দশ হাজার ফিট পর্য্যন্ত, মেঘাচ্ছন্নাবস্থায় ২·২ ভাগ, মেঘ না থাকিলে ২ ভাগ। বিশ হাজার ফিট ঊর্দ্ধে,

মেঘাচ্ছন্ন ১.১ ভাগ; মেঘ শূন্যে ১.২ ভাগ। ত্রিশ হাজার ফিট ঊর্দ্ধে মোট ৬২ ভাগ তাপ-হ্রাস পরীক্ষিত হইয়া ছিল। ইত্যাদি। তাপহ্রাস হেতু ঊর্দ্ধে স্থানেং তুষার কণা (Snow) দৃষ্ট হয়; এবং ব্যোমযান কখনং তন্মধ্যে পতিত হয়। ঊর্দ্ধে শীতাধিক্য, অনেক সময়ে যানারোহীদিগের কষ্টকর হইয়া উঠে —এমন কি অনেক সময়ে হাত পা অবশ হয়, এবং চেতনা অপহৃত হয়।

ঊর্দ্ধে তাপাভাবের কারণ তপ্ত বা তাপ্য সামগ্রীর অভাব। রৌদ্র ভূমে যেমন প্রখর, ঊর্দ্ধে বরং ততোধিক প্রখরতর বোধ হয়। কিন্তু তাহাতে কি তপ্ত হইবে? ভূমি অতি দূরে, বায়ু অতিক্ষীণ,—অল্প পরমাণু। দশ বারটি তুলার বস্তা উপর্য্যুপরি রাখিয়া দেখিবেন—উপরিস্থ তুলার ভারে, নিম্নস্থ বস্তার

তুলা গাঢ়তর হইয়াছে। তেমনি নিম্নস্থ বায়ুই গাঢ়—উপরিস্থ বায়ু ক্ষীণ। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে—যে এক ইঞ্চ দীর্ঘ প্রস্থে, এরূপ ভূমির উপরে যে ভার, তাহার পরিমাণ সাড়ে সাতসের। আমরা মস্তকের উপর অহরহঃ এই ভার বহন করিতেছি—তজ্জন্য কোন পীড়া বোধ করি না কেন? উত্তর, "অগাধ জল সঞ্চারী" মৎস্য উপরিস্থ বারিরাশির ভারে পীড়িত হয় না কেন? উপরিস্থ বায়ুস্তর সমূহের ভারে নিম্নস্থ বায়ুস্তর সকল ঘনীভূত—যত ঊর্দ্ধে যাওয়া যায়, বায়ু তত ক্ষীণ হইতে থাকে। গগনপর্য্যটকেরা ইহা পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন গুরুতা অনুসারে, ৩৮০ মাইল ঊর্দ্ধের মধ্যেই অর্দ্ধেক বায়ু আছে; এবং পাঁচ ছয় মাইলের মধ্যেই সমুদায় বায়ুর তিন ভাগের দুই ভাগ আছে।

এইজন্য ঊর্দ্ধে উঠিতে গেলে, নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য অত্যন্ত কষ্ট হয়। মসূর ফ্লামারিয় দশসহস্র ফীট ঊর্দ্ধে উঠিয়া, প্রথম বারে, যেরূপ কষ্ট অনুভূত করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এইরূপ করিয়াছেন, যথা—

"সাতটা বাজিতে এক পোওয়া থাকিতে আমার শরীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব আভ্যন্তরিক শীতলতা অনুভূত করিতে লাগিলাম। তৎসহিত তন্দ্রা আসিল। কষ্টে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলাম। কর্ণমধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ হইতে লাগিল এবং আধ মিনিট কাল, আমার হৃদ্রোগ উপস্থিত হইল। কণ্ঠ শুষ্ক হইল। আমি এক পাত্র জল পান করিলাম—তাহাতে উপকার বোধ হইল। যে বোতলে জল ছিল—তাহার ছিপি খুলিবার সময়ে, যেমন শ্যাম্পেনের বোতলের ছিপি সশব্দে বেগে উঠিয়া

পড়ে, জলের বোতলের ছিপি খুলিতে সেই রূপ হইল। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যা-ইতে পারে। তখন আমাদিগের মস্তকের উপর বায়ু, এক ভাগ কম হইয়াছিল। যখন বোতলে ছিপি আঁটিয়া গগনে যাত্রা করিয়া-ছিলাম, তখনকার অপেক্ষা এখনকার বায়ুর ভার এক ভাগ কম হইয়াছিল।"

দুই একবার গগন মার্গে যাতায়াত করিলে এ সকল কষ্ট সহ্য হইয়া আইসে, কিন্তু অ-ধিক ঊর্দ্ধে উঠিলে সহিষ্ণু ব্যক্তিরও কষ্ট হয়। গ্লেশর সাহেব এ সকল কষ্ট বিশেষ সহিষ্ণু ছিলেন, কিন্তু ছয় মাইল ঊর্দ্ধে উঠিয়া তিনিও চেতনাশূন্য ও মুমূর্ষু হইয়াছিলেন। ২৯০০০ ফিট উপরে উঠিলে পর, তাঁহার দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া আইসে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আর তাপমান যন্ত্রের পারদ স্তম্ভ অথবা ঘড়ির কাঁটা

দেখিতে সক্ষম হইলেন না। টেবিলের উপর এক হাত রাখিলেন। যখন টেবিলের উপর হাত রাখিলেন, তখন হস্ত সম্পূর্ণ সবল; কিন্তু তখনই সে হাত আর উঠাইতে পারিলেন না —তাহার শক্তি অন্তর্হিতা হইয়াছিল। তখন দেখিলেন দ্বিতীয় হস্তও সেই দশাপন্ন হইয়াছে—অবশ। তখন একবার গাত্রালোড়ন করিলেন, গাত্র চালনা করিতে পারিলেন, কিন্তু বোধ হইল যেন হস্ত পদাদি নাই। ক্রমে এইরূপে তাঁহার সকল অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল; ভগ্নগ্রীবের ন্যায় মস্তক লম্বিত হইয়া পড়িল, এবং দৃষ্টি একেবারে বিলুপ্ত হইল। এইরূপে তিনি অকস্মাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছিলেন, এমত সময়ে, হঠাৎ তাঁহার চৈতন্যও বিলুপ্ত হইল। পরে ব্যোমযানের "সারথি," রথ নামাইলে তিনি পুনর্ব্বার

জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন।

রথ নামাইল কি প্রকারে? ব্যোমযানের গতি দ্বিবিধ, প্রথম, ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ বা অধঃ হইতে ঊর্দ্ধ। দ্বিতীয় দিগন্তরে; যেমন শকটাদি অভিলষিত দিকে যায় সেই রূপ। ব্যোমযান অভিলষিত দিগন্তরে চালনা করা এ পর্য্যন্ত মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত হয় নাই—চালক মনে করিলে, উত্তরে, পশ্চিমে, বামে বা দক্ষিণে, সম্মুখে বা পশ্চাতে যান চালাইতে পারেন না। বায়ুই ইহার যথার্থ সারথি, বায়ুসারথি যে দিকে লইয়া যায়, ব্যোমযান সেই দিকে চলে। কিন্তু অধোর্দ্ধ গতি মনুষ্যের আয়ত্ত। ব্যোমযান লঘু করিতে পারিলেই ঊর্দ্ধে উঠিবে এবং পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুর অপেক্ষা গুরু করিতে পারিলেই নামিবে। ব্যোমযানের "রথে" কতকটা বালুকা বোঝাই থাকে; তাহার কিয়দংশ

নিক্ষিপ্ত করিলেই পূর্ব্বাপেক্ষা লঘুতা সম্পাদিত হয়—তখন ব্যোমযান আরও ঊর্দ্ধে উঠে। এইরূপে ইচ্ছাক্রমে ঊর্দ্ধে উঠা যায়। আর যে লঘু বায়ু কর্ত্তৃক বেলুন পরিপূরিত থাকায় তাহা গগনমণ্ডলে উঠিতে সক্ষম, তাহার কিয়-দংশ নির্গত করিতে পারিলেই উহা নামে। ঐ বায়ু নির্গত করিবার জন্য ব্যোমযানের শিরোভাগে একটি ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্র সচরাচর আবৃত থাকে, কিন্তু তাহার আবরণে একটি দড়ি বাঁধা থাকে; সেই দড়ি ধরিয়া টানিলেই লঘু বায়ু বাহির হইয়া যায়; ব্যোম-যান নামিতে থাকে।

দিগন্তরে গতি মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে বটে, কিন্তু মনুষ্য বায়ুর সাহায্য অবলম্বন করিতে সক্ষম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন দিগভিমুখে বায়ু

বহিতে থাকে। যখন ব্যোমারোহী ভূমির উপরে দক্ষিণ বায়ু দেখিয়া, যানারোহণ করিলেন তখনই হয়ত, কিয়দ্দূর উঠিয়া দেখিলেন যে বায়ু উত্তরে; আরও উঠিলে হয়ত দেখিবেন যে বায়ু পূর্ব্বে কি পুনশ্চ দক্ষিণে। ইত্যাদি। কোন্ স্তরে কোন্ সময়ে কোন্ দিকে বায়ু বহে, ইহা যদি মনুষ্যের জানা থাকিত, তাহা হইলে ব্যোমযান মনুষ্যের আজ্ঞাকারী হইত। যাঁহারা সুচতুর, তাঁহারা কখন কখন বায়ুর গতি অবধারিত করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে গগন পর্য্যটন করিয়াছেন। ১৮৬৮ শালের আগষ্ট মাসে মসূর তিসান্দর কালে নগর হইতে নেপ্চুননাম্‌ক বেলুনে গগনারোহণ করেন। চারি হাজার ফিট্ ঊর্দ্ধে উঠিয়া দেখিলেন যে তাঁহাদিগের গতি উত্তর সমুদ্রে! অপরাহ্নে এই রূপ তাঁহারা অকস্মাৎ

অনিচ্ছার সহিত, অনন্ত সাগরের উপর যাত্রা করিলেন। কিন্তু তখন উপায়ান্তর ছিলনা। এই শঙ্কটে তাঁহারা দেখিলেন যে নিম্নে মেঘ সকল দক্ষিণগামী। তখন তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া সমুদ্র বিহারে চলিলেন। এই রূপে তাঁহারা ২১ মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্রোপরে বাহির হইয়া যান। তাহার পর লঘু বায়ু নির্গত করিয়া দিয়া, নীচে নামেন। বায়ুর সেই নিম্ন স্তরে দক্ষিণ বায়ু পাইয়া তৎকর্ত্তৃক বাহিত হইয়া পুনর্ব্বার ভূমির উপরে আসেন। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ অবতরণ করেন না। তার পর সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইল। বাষ্পের গাঢ়তা বশতঃ নিম্নে ভূতল দেখা যাইতেছিল না। এমত অবস্থায় তাঁহারা কোথায় যাইতে-ছিলেন, তাহা জানিতে পারেন নাই। অকস্মাৎ নিম্ন হইতে গম্ভীর সমুদ্র কল্লোল উত্থিত হ-

ইল। তখন অন্ধকারে পুনর্ব্বার অনন্ত সা, গরোপরে বিচরণ করিতেছেন জানিতে পারিয়া, তাঁহারা আবার নিম্নে নামিলেন। আবার দক্ষিণবায়ুর সাহায্যে ভূমি প্রাপ্ত হইলেন।

উত্তর সমুদ্রে বিচরণ কালে তাঁহারা কয়েকটি অদ্ভুত ছায়া দেখিয়াছিলেন। দেখিলেন যে সমুদ্রে যে সকল বাষ্পীয়াদি জাহাজ চলিতেছিল, ঊর্দ্ধে মেঘমধ্যে তাহার প্রতিবিম্ব। মেঘমধ্যে তেমনি সমুদ্র চিত্রিত হইয়াছে—সেই চিত্রিত সমুদ্রে তেমনি প্রকৃত জাহাজের ন্যায় ছায়ার জাহাজ চলিতেছে। সেই সকল জাহাজের তলদেশ ঊর্দ্ধে, মাস্তুর নিম্নে; বিপরীত ভাবে, জাহাজ চলিতেছে। মেঘরাশি বৃহদ্দর্পণ স্বরূপ সমুদ্রকে প্রতিবিম্বিত করিয়াছিল।

মসূর ফ্লামারিয়ঁ আর একটি আশ্চর্য্য প্র-

অনিচ্ছার সহিত, অনন্ত সাগরের উপর যাত্রা করিলেন। কিন্তু তখন উপায়ান্তর ছিলনা। এই শঙ্কটে তাঁহারা দেখিলেন যে নিম্নে মেঘ সকল দক্ষিণগামী। তখন তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া সমুদ্র বিহারে চলিলেন। এই রূপে তাঁহারা ২১ মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্রোপরে বাহির হইয়া যান। তাহার পর লঘু বায়ু নির্গত করিয়া দিয়া, নীচে নামেন। বায়ুর সেই নিম্ন স্তরে দক্ষিণ বায়ু পাইয়া তৎকর্ত্তৃক বাহিত হইয়া পুনর্ব্বার ভূমির উপরে আসেন। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ অবতরণ করেন না। তার পর সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইল। বাষ্পের গাঢ়তা বশতঃ নিম্নে ভূতল দেখা যাইতেছিল না। এমত অবস্থায় তাঁহারা কোথায় যাইতে-ছিলেন, তাহা জানিতে পারেন নাই। অকস্মাৎ নিম্ন হইতে গম্ভীর সমুদ্র কল্লোল উত্থিত হ-

ইল। তখন অন্ধকারে পুনর্ব্বার অনন্ত সা,গরোপরে বিচরণ করিতেছেন জানিতে পারিয়া, তাঁহারা আবার নিম্নে নামিলেন। আবার দক্ষিণবায়ুর সাহায্যে ভূমি প্রাপ্ত হইলেন।

উত্তর সমুদ্রে বিচরণ কালে তাঁহারা কয়েকটি অদ্ভুত ছায়া দেখিয়াছিলেন। দেখিলেন যে সমুদ্রে যে সকল বাষ্পীয়াদি জাহাজ চলিতেছিল, ঊর্দ্ধে মেঘমধ্যে তাহার প্রতিবিম্ব। মেঘমধ্যে তেমনি সমুদ্র চিত্রিত হইয়াছে—সেই চিত্রিত সমুদ্রে তেমনি প্রকৃত জাহাজের ন্যায় ছায়ার জাহাজ চলিতেছে। সেই সকল জাহাজের তলদেশ ঊর্দ্ধে, মাস্তুর নিম্নে; বিপরীত ভাবে, জাহাজ চলিতেছে। মেঘরাশি বৃহদ্দর্পণ স্বরূপ সমুদ্রকে প্রতিবিম্বিত করিয়াছিল।

মসূর ফ্লামারিয়ঁ আর একটি আশ্চর্য্য প্র-

তিবিম্ব দেখিয়াছিলেন। দিবাভাগে, প্রায় পাঁচ সহস্র ফিট, ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদিগের প্রায় শত ফিট মাত্র দূরে, দ্বিতীয় একটি বেলুন চলিয়াছে। আরও দেখিলেন, যে সেই দ্বিতীয় বেলুনটির আকৃতি তাঁহাদিগের বেলুনেরই আকৃতি,, যেমন তাঁহাদিগের বেলুনের নিম্নে "রথ" যুক্ত ছিল, এবং তাহাতে যাঁহারা দুই জন আরোহী বসিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বেলুনেও সেইরূপ রথ, এবং সেইরূপ দুই জন আরোহী! আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে সেই দুইজন আরোহীর অবয়ব—তাঁহাদিগেরই অবয়ব! তাঁহারাই সেই দ্বিতীয় বেলুনে বসিয়া আছেন! একটি বেলুনে যেখানে যাহা ছিল—যেখানে যে দড়ি, যেখানে যে সূতা, যেখানে যে যন্ত্র, দ্বিতীয় বেলুনে ঠিক্ তাহাই আছে! মসূর ফ্লামারিয়ঁ

দক্ষিণ হস্তোত্তোলন করিলেন—ভৌতিক ফ্লা-
মারিয়ঁ বাম হস্তোত্তোলন করিল! তাঁহার সঙ্গী
একটা পতাকা উড়াইলেন—ভৌতিক সঙ্গী
একটা তদ্রূপ পতাকা উড়াইল।

আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে সেই
ভৌতিক ব্যোমযানের ভৌতিক রথের চতুঃ
পার্শ্বে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল সকল প্রতি-
ভাত হইতেছিল। মধ্যে হরিৎ শ্বেতাভ মণ্ডল,
তন্মধ্যে রথ। তৎপার্শ্বে ক্ষীণ নীল মণ্ডল;
তাহার বাহিরে হরিদ্রাবর্ণ মণ্ডল; তৎপরে
কপিশ রক্তাভ মণ্ডল, শেষে অতসীকুসুমবৎ
বর্ণ; তাহা ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া মেঘের সঙ্গে
মিশাইয়া গিয়াছে।

এইবৃত্তান্ত বুঝাইবার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রব
ন্ধের মধ্যে হইতে পারে না। ইহা বলিলেই
যথেষ্ট হইবে, যে ইহা জলবাষ্পের উপর প্রতি-

সৌর বিম্ব* মাত্র।

গগনপথে পার্থিব শব্দ সহজে গমন করে, কিন্তু সকল সময়ে নহে, এবং সকল শব্দের গতি তুল্য রূপ নহে। মেঘাচ্ছন্নে শব্দরোধ ঘটে। গ্লেশর সাহেব চারি মাইল উর্দ্ধ হইতে রেইলওয়ে ট্রেনের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন। এবং বিশহাজার ফিট উপরে থাকিয়া কামানের শব্দ শুনিয়াছিলেন। একটি ক্ষুদ্র কুক্কুরের রব দুই মাইল উপর হইতে শুনিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু চারি হাজার ফিট উপরে থাকিয়া বহুসংখ্যক মনুষ্যের কোলাহল শুনিতে পান নাই। মসূর ফ্লমারিয়ঁ আকাশ হইতে ভূমণ্ডলের বাদ্য শুনিতে পাইতেন। তাঁহার বোধ হইত যেন মেঘমধ্যে কে সঙ্গীত করিতেছে।

* Ant' helia

অনেকেই অবগত আছেন, যে যখন পারিশ অবরুদ্ধ হয়, তখন ব্যোমযানযোগে পারিশ হইতে গ্রাম্য প্রদেশে ডাক যাইত। শিক্ষিত পারাবত সকল সেই সকল ব্যোমযানে চড়িয়া যাইত; তাহাদের পুচ্ছে উত্তর বাঁধিয়া দিলে লইয়া ফিরিয়া আসিত। লঘুতার অনুরোধে সেই সকল পত্র ফটোগ্রাফের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্রাকারে লিখিত হইত—অতিবৃহৎ পত্র এক ইঞ্চির মধ্যে সমাবিষ্ট হইত। পড়িবার সময়ে অনুবীক্ষণ ব্যবহার করিতে হইত। স্থানাভাব বশতঃ এই কৌতুকাবহ তত্ত্ব আমরা সবিস্তারে লিখিতে পারিলাম না।

উপসংহার কালে বক্তব্য যে ব্যোমযান এখনও সাধারণের গমনাগমনের উপযোগী বা যথেচ্ছ বিহারের উপায় স্বরূপ হয় নাই। গ্লেশর সাহেব বলেন, যে বেলুনের দ্বারা সে

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না; যানান্তর ইহার দ্বারা সূচিত হইতে পারে; যানান্তর সূচিত না হইলে সে আশা পূর্ণ হইবে না। মনুষ্য কখন উড়িতে পারিবে কি না, মসূর ফ্লমারিয়ঁ এই তত্ত্বের সবিস্তারে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে একদিন মনুষ্যগণ অবশ্য পক্ষীদিগের ন্যায় উড়িতে পারিবে; কিন্তু আত্মবলে নহে। যখন মনুষ্য, পক্ষ বা পক্ষ-বৎ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক বলে তাহা সঞ্চালন করিতে পারিবে, তখন মনুষ্যের বিহঙ্গ পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। দে লোম নামক একজন ফরাশী একটি মৎস্যাকার বেলুন কল্পনা করিয়াছেন, তিনি বিবেচনা করেন তৎসাহায্যে মনুষ্য যথেচ্ছা আকাশ পথে যাতায়াত করিতে পারিবে। কিন্তু সে যন্ত্র হইতে এপর্য্যন্ত কোন ফলোদয় হয় নাই

বলিয়া আমরা তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম না।

চঞ্চল জগৎ।

সচরাচর মনুষ্যের বোধ এই যে গতি, জগতের বিশেষ অবস্থা; স্থিরতা জগতের স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে, যে গতিই স্বাভাবিক অবস্থা; স্থিরতা কেবল গতির রোধ মাত্র। যাহা গতিবিশিষ্ট কারণ বশতঃ তাহার গতির রোধ হইলে,তাহার অবস্থাকে আমরা স্থিরতা বা স্থিতি বলি। যে শিলা খণ্ড, বা অট্টালিকাকে অচল বিবেচনা করিতেছি, বাস্তবিক তাহার মাধ্যাকর্ষণের বলে গতিবিশিষ্ট; নিম্নস্থ ভূমি তাহার গতি রোধ করিতেছে' বলিয়া তাহাকে স্থির

বলিতেছি। এ স্থিরতাও কাল্পনিক; পৃথিবী-তলস্থ অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিতেছি যে এই পর্ব্বত বা এই অট্টালিকা, অচল, গতিশূন্য—বস্তুতঃ উহার কেহই অচল বা গতিশূন্য নহে, পৃথিবীর উপরে থাকিয়া উহা পৃথিবীর সঙ্গে আবর্ত্তন করিতেছে। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিতে গেলে জগতে কিছুই গতিশূন্য নহে।

কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্। যাহা পৃথিবীর গতিতে গতিবিশিষ্ট তাহাকে চঞ্চল বলিবার প্রয়োজন করে না। তথাপিও পৃথিবীতে এমত কোন বস্তু নাই, যে মুহূর্ত্তজন্য স্থির।

চারিপার্শ্বে চাহিয়া দেখ, বায়ু বহিতেছে, বৃক্ষপত্র সকল নাচিতেছে, জল চলিতেছে, জীব সকল নিজ নিজ প্রয়োজন সম্পাদনার্থ

বিচরণ করিতেছে। পরন্তু ইহার মধ্যেও কোন২ বস্তু গতিশূন্য দেখা যাইতেছে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণে বা অন্যপ্রকারে রুদ্ধ বাহ্যিকগতি ভিন্ন, ঐ সকল বস্তুর অন্য গতি আছে। সেই সকল গতি আভ্যন্তরিক।

বস্তু মাত্রেরই কিয়ৎ পরিমাণে তাপ আছে। যাহাকে শীতল বলি, তাহা বস্তুতঃ তাপশূন্য নহে। তাপের অল্পতাকেই শীতলতা বলি, তাপের অভাব কিছুতেই নাই। যে তুষার-খণ্ডের স্পর্শে অঙ্গচ্ছেদের ক্লেশানুভব করিতে হয়, তাহাতেও তাপের অভাব নাই—অল্পতা মাত্র।

যাহাকে তাপ বলি, তাহা পরামাণুগণের আন্দোলন মাত্র। কোন বস্তুর পরমাণু সকল পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট এবং সন্তাড়িত হইলে, তাহা তরঙ্গবৎ আন্দোলিত হইতে থাকে।

সেই ক্রিয়াই তাপ। যেখানে সকল বস্তুই তাপযুক্ত, সেখানে সকল বস্তুর পরমাণুই অহ-রহ পরস্পর কর্ত্তৃক আকৃষ্ট, সন্তাড়িত, এবং সঞ্চালিত। অতএব পৃথিবীস্থ সকল বস্তুই আভ্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট।

আলোক সম্বন্ধেও সেই কথা। ইথর নামক বিশ্বব্যাপী আকাশীয় তরল পদার্থের পরমাণু সমষ্টির তরঙ্গবৎ আন্দোলনই আ-লোক। সেই গতিবিশিষ্ট পরমাণু সকলের সঙ্গে নয়নেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আলোক অনুভূত হয়। সেই প্রকার তাপীয় তরঙ্গসহিত ত্বগি-ন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে তাপ অনুভূত করি। এই সকল আন্দোলন ক্রিয়া মনুষ্যের দৃষ্টির অগোচর—উহা তাপরূপে এবং আলোকরূপেই আমরা ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক গ্রহণ করিতে পারি—অন্য রূপে নহে। তবে এই আন্দোলন ক্রিয়ার

অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কারণ কি? ইউরো-পীয় বিজ্ঞানবিদেরা তাহা স্বীকার করিবার বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা এস্থলে বর্ণনীয় নহে।

পৃথিবীতলে আলোক সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। অতি অন্ধকার অমাবস্যার রাত্রে, পৃথিবীতল একেবারে আলোকশূন্য নহে। অতএব সর্ব্বত্রেই সর্ব্বদা আলোকীয় আন্দোলনের গতি বর্ত্তমান।

বিজ্ঞানবিদেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে আলোক, তাপ, এবং মাধ্যাকর্ষণ তিনটিই পরমাণুর গতি মাত্র। অতএব পৃথিবীর সকল বস্তুই আভ্যন্তরিক গতি বিশিষ্ট। যৌগিক আকর্ষণের বলে সেই সকল গতি সত্ত্বেও কোন বস্তুর পরমাণু সকল বিস্রস্ত ও পৃথগ্‌ভূত হয় না।

পৃথিবীতলে এইরূপ। তারপর, পৃথিবীর বাহিরে কি?

পৃথিবী স্বয়ং অত্যন্ত প্রখর বেগ বিশিষ্টা, এবং অনন্তকাল আকাশমার্গে ধাবমানা। পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি যাহা সৌর জগতের অন্তর্গত তাহাও পৃথিবীর মত অবস্থাপন্ন সন্দেহ নাই। সেই সকল গ্রহ উপগ্রহে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাও পার্থিবপদার্থের ন্যায় সর্ব্বদা বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক গতি বিশিষ্ট। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের দৌরবীক্ষণিক অনুসন্ধানে সে কথার অনেক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে।

সূর্য্য নামে যে বৃহৎ বস্তু এই সৌর জগতের কেন্দ্রীভূত, তাহা যেরূপ চাঞ্চল্যপূর্ণ, তাহা মনুষ্যের অনুভব শক্তির অতীত। যে সূর্য্যমণ্ডলের তাপ, আলোক, আকর্ষণ এবং বৈদ্যু-

তাদিকী শক্তি পৃথিবীস্থ গতি মাত্রেরই কারণ, সেই সূর্য্যমণ্ডলোপরে বা তদভ্যন্তরে যে নানাবিধ ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুত গতি নিয়ত বর্ত্তিবে, তাহা বলা বাহুল্য। সেই চাঞ্চল্যের একটি উদাহরণ বঙ্গদর্শনের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় "আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত" নামক প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছিল।

কিন্তু সূর্য্যোপরে এবং সূর্য্যগর্ভে যে নিয়ত গতির আধিপত্য, কেবল ইহাই নহে। সূর্য্য স্বয়ং গতি বিশিষ্ট। বিজ্ঞানবিদেরা স্থির করিয়াছেন, যে সূর্য্য স্বয়ং এই তাবৎ সৌরজগৎ সঙ্গে লইয়া প্রতি সেকেণ্ডে ৪৮০ মাইল অর্থাৎ ঘণ্টায় ১৭১০০ মাইল আকাশ পথে ধাবিত হইতেছে। এই ভয়ঙ্কর বেগে এই পদার্থরাশি কোথায় যাইতেছে? কেহ বলিতে পারে না কোথায় যাইতেছে। আকাশের

একটি নাক্ষত্রিক প্রদেশকে ইউরোপীয়েরা হরক্যুলিজ বলেন। সূর্য্য তন্মধ্যস্থ লাম্‌ডা নামক নক্ষত্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, কেবল এই পর্য্যন্ত নিশ্চিত হইয়াছে।

কিন্তু সূর্য্য এবং সৌরজগৎ ত বিশ্বের অতি ক্ষুদ্রাংশ। অন্ধকার রাত্রে অনন্ত আকাশমণ্ডল ব্যাপিয়া যে সকল জ্যোতিষ্ক জ্বলিতে থাকে, তাহারা সকলেই এক একটি সৌর জগতের কেন্দ্রীভূত। সে সকল কি? গতি শূন্য? তাহাদিগেরও প্রাত্যহিক উদয়াস্তাদি গতি দেখিতে পাই, সেও পৃথিবীর প্রাত্যহিক আবর্ত্তনজনিত চাক্ষুষ ভ্রান্তি মাত্র। নাক্ষত্রিক লোকেও কি জগৎ চঞ্চল?

জ্যোতির্ব্বিদ্যার দ্বারা যত দূর অনুসন্ধান হইয়াছে, ততদূর জানিতে পারা গিয়াছে, যে নক্ষত্র লোকেও গতি সর্ব্বময়ী। যত অনুস-

ন্ধান হইয়াছে, ততই বুঝা গিয়াছে যে সূর্য্যের যে প্রকৃতি নক্ষত্র মাত্রেরই সেই প্রকৃতি। গ্রহ-ভিন্ন অন্য তারাকে নক্ষত্র বলিতেছি।

কতকগুলি নক্ষত্র সৌর গ্রহগণের ন্যায় বর্ত্তনশীল। যেখানে আমরা চক্ষে একটি নক্ষত্র দেখিতে পাই, দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে তথায় কখন২ দুইটি, তিনটি বা ততোধিক নক্ষত্র দেখা যায়। কখন২ ঐ দুই তিনটি নক্ষত্র পরস্পরের সহিত সম্বন্ধরহিত, এবং পরস্পর হইতে দূরস্থিত, অথচ দর্শক যেখান হইতে দেখিতেছেন, সেখান হইতে দেখিতে গেলে আকাশের একদেশে স্থিত দেখায়, এবং একটি সরল রেখার মধ্যবর্ত্তী হইয়া যুগ্ম নক্ষত্রের ন্যায় দেখায়। কিন্তু কখন২ দেখা যায় যে, যে নক্ষত্রদ্বয় দেখিতে যুগ্ম, তাহা বাস্তবিক যুগ্মই বটে,—পরস্পরের নিকট-

বর্ত্তী এবং পরস্পরের সহিত নৈসর্গিক সম্বন্ধ বিশিষ্ট। এই সকল যুগ্মাদি নক্ষত্র সম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা পর্য্যবেক্ষণা ও গণনার দ্বারা স্থিরীকৃত করিয়াছেন যে উহারা পরস্পরকে বেড়িয়া বর্ত্তন করিতেছে। অর্থাৎ যদি ক, খ, এই দুইটি নক্ষত্রে একটি যুগ্ম নক্ষত্র হয়, তবে ক, খ, উভয়ের মাধ্যাকর্ষণিক কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে ক, খ, উভয় নক্ষত্র বর্ত্তন করিতেছে। কখন২ দেখা গিয়াছে, যে এই রূপ দুইটি কেন, বহু নক্ষত্রে এক একটি নাক্ষত্রিক জগৎ। তন্মধ্যস্থ বিভক্ত নক্ষত্রগুলি সকলই ঐ প্রকার আবর্ত্তনকারী। বিচিত্র এই যে নিউটন, পৃথিবীতে বসিয়া, পার্থিব পদার্থের গতি দেখিয়া, পার্থিব উপগ্রহ চন্দ্রের গতিকে উপলক্ষ করিয়া, যে সকল মাধ্যাকর্ষণিক গতির নিয়ম আবিষ্কৃত করিয়া ছিলেন,

দূরবর্ত্তী এবং সৌরজগতের বহিঃস্থ এই সকল নক্ষত্রের গতিও সেই সকল নিয়মাধীন।

নক্ষত্রগণের প্রকৃতি এবং সূর্য্যের প্রকৃতি যে এক, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। ডাক্তার হুগিন্‌স্‌ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা আলোক পরীক্ষক যন্ত্রের সাহায্যে জানিয়াছেন, যে, যে সকল বস্তুতে সূর্য্য নির্ম্মিত, অন্যান্য নক্ষত্রেও সেই সকল বস্তু লক্ষিত হয়। অতএব সূর্য্যোপরি ও সূর্য্যগর্ব্ভে যে প্রকার ভয়ঙ্কর কোলাহল, ও বিপ্লব, নিত্য বর্ত্তমান বলিয়া বোধ হয়, তারাগণেও সেই রূপ হইতেছে, সন্দেহ নাই। যে নক্ষত্র দূরবীক্ষণ সাহায্যেও অস্পষ্ট দৃষ্ট আলোকবিন্দু বলিয়া বোধ হয়, তাহাতে ক্ষণমাত্রে যে সকল উৎপাত ঘটিতেছে, পৃথিবীতলে দশবর্ষের নৈসর্গিক ক্রিয়া একত্রিত করিলেও তাহার তুল্য হইবে না। সূর্য্যমণ্ডলে

সামান্য মাত্র কোন পরিবর্ত্তনে যে বিপ্লব ও নৈসর্গিক শক্তিব্যয় সূচিত হয়, তাহাতে পলক মাত্রে এই পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে। প্রচণ্ড বাত্যার কল্লোল অথবা কর্ণবিদারক অ-শনি সম্পাত শব্দ হইতে লক্ষ লক্ষ লক্ষগুণে ভীমতর কোলাহল অনবরত সেই সৌরমণ্ডলে নির্ঘোষিত হইতেছে সন্দেহ নাই। আর এই যে সহস্র সহস্র, স্থির, শীতল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কগণ দেখিতেছি, তাহাতেও সেইরূপ হইতেছে, কেননা সকলই সূর্য্যপ্রকৃতি বিশিষ্ট, বরং আমাদিগের সূর্য্য অনেক অনেক নক্ষত্রের অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং হীনতেজা। সিরিয়স না-মক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র, আমাদিগের নয়ন হইতে যত দূরে আছে, আমাদিগের সূর্য্য ততদূরে প্রেরিত হইলে, উহা তৃতীয়শ্রেণীর ক্ষুদ্র নক্ষ-ত্রের ন্যায় দেখাইত; আকাশের কতশত ন-

ক্ষত্র তদপেক্ষা উজ্জ্বল জ্বালায় জ্বলিত! কিন্তু যদি সূর্য্যকে অল্‌দেবরণ (রোহিণী?) কস্তর, বেটেলগুস্‌ প্রভৃতি নক্ষত্রের স্থানে প্রেরণ করা যায়, তবে সূর্য্যকে দেখা যাইবে কি না সন্দেহ। প্রক্‌টর সাহেব বলেন যে আকাশে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, বোধ হয় তাহার মধ্যে পঞ্চাশটিও আমাদের সূর্য্যাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইবে না। অতএব সূর্য্যমণ্ডলে যেরূপ চাঞ্চল্যের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়, অধিকাংশ নক্ষত্রে ততোধিক চাঞ্চল্য বর্ত্তমান, সন্দেহ নাই।

কেবল তাহাই নহে, সূর্য্য যেমন অতি প্রচণ্ডবেগে, গ্রহগণ সহিত, আকাশ পথে ধাবমান, অন্যান্য নক্ষত্রগণও তদ্রূপ। বরং অনেক নক্ষত্রের বেগ সূর্য্যাপেক্ষা প্রচণ্ডতর। সিরিয়সের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ২০ মাইল,

ঘণ্টায় ৭২০০০ মাইল। বেগা নামক উজ্জ্বল নক্ষত্রের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ মাইল, ঘণ্টায় ১৮০০০০ মাইল; কাষ্টর প্রতি সেকেণ্ডে ২৫ মাইল, ঘণ্টায় ৩৬০০০ মাইল। পোলাক্সের গতি সেকেণ্ডে ৪৯ মাইল, প্রায় বেগার ন্যায়। সপ্তর্ষির মধ্যের পাঁচটির গতি সিরিয়সের ন্যায়, একটির গতি বেগার ন্যায়। এই বেগ অতি ভয়ঙ্কর, বিশেষ যখন মনে করা যায় যে এই সকল প্রচণ্ডবেগশালী পদার্থের আকার অতি প্রকাণ্ড (সিরিয়স সূর্য্যাপেক্ষা সহস্রগুণ বৃহৎ) তখন বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না।

নক্ষত্র সকল অদ্ভুত গতিবিশিষ্ট হইলেও, চারি সহস্র বৎসরেও তত্তাবতের স্থানভ্রংশ মনুষ্যচক্ষে লক্ষিত হয় নাই। ঐ সকল নক্ষত্রের অসীম দূরতাই ইহার কারণ। উৎকৃষ্ট

দূরবীক্ষণ সাহায্যে, আশ্চর্য্য মান যন্ত্র ও বিদ্যা
কৌশলের বলে আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা কি-
ঞ্চিৎ স্থানচ্যুতি পর্য্যবেক্ষিত করিয়াছেন। তাহা-
তেই ঐ সকল গতি স্থিরীকৃত হইয়াছে।

নাক্ষত্রিক গতিতত্ত্ব অতি আশ্চর্য্য। গগ-
নের এক দেশে স্থিত নক্ষত্রও একদিকেই ধাব-
মান না হইয়াও নানাদিকে ধাবমান। কখন
বা একদিকেই ধাবমান। কোথায় ধাবমান?
কেন ধাবমান? সে সকল তত্ত্বের আলোচনা
এস্থলে নিষ্প্রয়োজনীয়, এবং এক প্রকার অ-
সাধ্য।

যাহা বলা গেল, তাহাতে প্রতীয়মান হই-
তেছে, যে গতিই জাগতিক নিয়ম—স্থিতি
নিয়ম রোধের ফলমাত্র। জগৎ সর্ব্বত্র, স-
র্ব্বদা, চঞ্চল। সেই চাঞ্চল্য বিশেষ করিয়া
বুঝিতে গেলে, অতি বিস্ময়কর বোধ হয়।

জীবনাধারে, শোণিতাদির চাঞ্চল্যই জীবন। হৃৎপিণ্ড বা শ্বাসযন্ত্রের চাঞ্চল্য রহিত হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলে পরেও, দৈহিক পরমাণু মধ্যে রাসায়নিক চাঞ্চল্য সঞ্চার হইয়া, দেহ ধ্বংস হয়। যেখানে দৃষ্টিপাত করিব, সেইখানে চাঞ্চল্য, সেই চাঞ্চল্য মঙ্গলকর। যে বুদ্ধি চঞ্চলা, সেই বুদ্ধি চিন্তাশালিনী! যে সমাজ গতি বিশিষ্ট, সেই সমাজ উন্নতিশীল। বরং সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ভাল, তথাপি স্থিরতা ভাল নহে।

কত কাল মনুষ্য।

প্রথম সংখ্যা।

জলে যেরূপ বুদ্বুদ উঠিয়া তখনই বিলীন হয়, পৃথিবীতে মনুষ্য সেই রূপ জন্মিতেছে ও মরিতেছে। পুত্রের পিতা ছিল, তাহার

পিতা ছিল, এই রূপ অনন্ত মনুষ্য শ্রে
ম্পরা সৃষ্ট এবং গত হইয়াছে, হ
এবং যত দূর বুঝা যায়, ভবিষ্যতেও
ইহার আদি কোথা? জগদাদির সঙ্গে
ষ্যের আদি, না পৃথিবীর সৃষ্টির বহুপরে
মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে? পৃথিবীতে
কত কাল আছে?

খ্রীষ্টান দিগের প্রাচীন গ্রন্থানুসা
ষ্যের সৃষ্টি, এবং জগতের সৃষ্টি কালি
হইয়াছে। যেদিন জগদীশ্বর কুম্ভকা
কাদা ছানিয়া পৃথিবী গড়িয়া, ছয়দিনে
মনুষ্যাদি পুত্তল সাজাইয়া ছিলেন, খ্রী
অনুমান করেন যে সে ছয় সহস্র
পূর্ব্বে। একথা খ্রীষ্টানেরাও আর বিশ্ব
রেন না। আমাদিগের ধর্ম্মপুস্তকের কথা

জ্ঞানের প্রবাহে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মপুস্তক সকল ভাসিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থে এমত কোন কথা নাই যে তাহাতে বু- ঝায় যে আজি কালি, বা ছয় শত বৎসর বা ছয় সহস্র বৎসর, বা ছয় বৎসর পূর্ব্বে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রানু- সারে কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে, অথবা অ- নন্ত কাল পূর্ব্বে জগতের সৃষ্টি। আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানেরও সেই মত।

তবে জগতের আদি আছে কি না, কেহ কেহ এই তর্ক তুলিয়া থাকেন। সৃষ্টি অনাদি, এ জগৎ নিত্য; ও সকল কথায় বুঝায় যে সৃষ্টির আরম্ভ নাই। কিন্তু সৃষ্টি একটি ক্রিয়া—ক্রিয়া মাত্র, কোন বিশেষ সময়ে কৃত হইয়াছে; অতএব সৃষ্টি কোন কাল বিশেষে হইয়া থাকিবে। অতএব সৃষ্টি অ-

নাদি বলিলে, অর্থ হয় না। যাঁহারা বলেন সৃষ্টি হইতেছে, যাইতেছে, আবার হইতেছে, এই রূপ অনাদি কাল হইতে হইতেছে, তাঁহারা প্রমাণ শূন্য বিষয়ে বিশ্বাস করেন। একথার নৈসর্গিক প্রমাণ নাই।

"অসৃজচ্চ জগৎসর্ব্বং সহ পুত্রৈঃ কৃতাত্মভিঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সূচিত হয়, যে জগৎ সৃষ্টি এবং মনুষ্য বা মনুষ্যজনক দিগের সৃষ্টি এক কালেই হইয়াছিল। এরূপ বাক্য হিন্দু গ্রন্থে অতি সচরাচর দেখা যায়। যদি এ কথা যথার্থ হয়, তাহা হইলে, যত কাল চন্দ্র সূর্য্য, ততকাল মনুষ্য। বৈজ্ঞানিকেরা এতত্ত্বে কি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই সমালোচিত করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞানের অদ্যাপি এমত শক্তি হয় নাই যে জগৎ অনাদি কি সাদি তাহার মীমাংসা

করেন। কোন কালে সে মীমাংসা হইবে কি না, তাহাও সন্দেহের স্থল। তবে এক কালে, জগতের যে এরূপ ছিল না, বিজ্ঞান ইহা বলিতে সক্ষম। ইহা বলিতে পারে, যে এই পৃথিবী এইরূপ তৃণ শস্য বৃক্ষময়ী, সাগর পর্ব্বতাদি পরিপূর্ণা, জীবসঙ্কুলা, জীব বাসোপযোগিনী ছিলনা; গগন এককালে এরূপ সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি বিশিষ্ট ছিল না। একদিন —তখন দিন, হয় নাই—এককালে, জল ছিল না, ভূমি ছিল না—বায়ু ছিল না। কিন্তু যাহাতে এই চন্দ্র সূর্য্য তারা হইয়াছে, যাহাতে জল বায়ু ভূমি হইয়াছে—যাহাতে নদ নদী সিন্ধু—বন বিটপী বৃক্ষ—তৃণ লতা পুষ্প—পশু পক্ষী মানব হইয়াছে তাহা ছিল। জগতের রূপান্তর ঘটিয়াছে, ইহা বিজ্ঞান বলিতে পারে। কবে ঘটিল, কি প্রকারে ঘটিল, তাহা বিজ্ঞান বলিতে

পারে না। তবে ইহাই বলিতে পারে যে সকলই নিয়মের বলে ঘটিয়াছে—ক্ষণিক ইচ্ছা-ধীন নহে। যে সকল নিয়মে অদ্যাপি জড় প্রকৃতি শাসিতা হইতেছে, সেই সকল নিয়-মের ফলেই এই ঘোর রূপান্তর ঘটিয়াছে। সেই সকল নিয়মে? তবে আর সেরূপ রূপা-ন্তর দেখি না কেন? দেখিতেছি। তিল তিল করিয়া, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জগতের রূপান্তর ঘটি-তেছে। কোটি কোটি বৎসর পরে, পৃথিবী কি ঠিক এই রূপ থাকিবে? তাহা নহে।

কিরূপে এই ঘোর রূপান্তর ঘটিল, এ প্র-শ্নের একটি উত্তর অতি বিখ্যাত। আমরা লাপ্লাসের মতের কথা বলিতেছি। লাপ্লাসের মত ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও জানেন—সংক্ষেপে বর্ণিত করিলেই হইবে। লাপ্লাস সৌরজগতের উৎপত্তি বুঝাইয়াছেন। তিনি

বলেন, মনে কর, আদৌ সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহাদি নাই, কিন্তু সৌরজতের প্রান্ত অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র সমভাবে, সৌরজগতের পরমাণু সকল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। জড় পরমাণু মাত্রেরই, পরস্পরাকর্ষণ, তাপক্ষয়, সঙ্কোচন প্রভৃতি যে সকল গুণ আছে, ঐ জগদ্ব্যাপী পরমাণুরও থাকিবে। তাহার ফলে, ঐ পরমাণুরাশি, পরমাণুরাশির কেন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া ঘূর্ণিত হইতে থাকিবে। এবং তাপক্ষতির ফলে ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। সঙ্কোচনকালে, পরমাণু জগতের বহিঃপ্রদেশ সকল মধ্যভাগ হইতে বিযুক্ত হইতে থাকিবে। বিযুক্ত ভগ্নাংশ পূর্ব্ব সঞ্চিত বেগের গুণে মধ্য প্রদেশকে বেড়িয়া ঘূরিতে থাকিবে। যে সকল কারণে বৃষ্টিবিন্দু গোলত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই সকল কারণে ঘূরিতে ঘূরিতে সেই ঘূর্ণিত বিযুক্ত ভগ্নাংশ,

গোলাকার প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে এক এ-
কটি গ্রহের উৎপত্তি। এবং তাহা হইতে
উপগ্রহগণেরও এরূপে উৎপত্তি। অবশিষ্ট
মধ্যভাগ, সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান সূর্য্যে
পরিণত হইয়াছে।

যদি স্বীকার করা যায়, যে আদৌ পরমাণু
মাত্র, আকার শূন্য হইয়া জগৎ ব্যাপিয়া ছিল
—জগতে আর কিছুই ছিল না—তাহাহইলে
ইহা সিদ্ধ হয় যে প্রচলিত নৈসর্গিক নিয়মের
বলে জগৎ সূর্য্য,* চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু-
বিশিষ্ট হইবে—ঠিক্ এখন যেরূপ, সেইরূপ
হইবে। প্রচলিত নিয়ম ভিন্ন অন্য প্রকার
ঐশিক আজ্ঞার সাপেক্ষ নহে। এই গুরুতর

*গতিশূন্য নক্ষত্র মাত্রেই সূর্য্য। জগতে কোটি কোটি
সূর্য্য।

তত্ত্ব, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বুঝাইবার সম্ভাবনা নহে—এবং ইহা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হইতেও পারে না। আমাদের সে উদ্দেশ্যও নহে। যাঁহারা বিজ্ঞানালোচনায় সক্ষম তাঁহারা এই নৈহারিক উপপাদ্য সম্বন্ধে হর্বট স্পেন্সেরের বিচিত্র প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। দেখিবেন, যে স্পেন্সের কেবল আকার শূন্য পরমাণু সমষ্টির অস্তিত্ব মাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহাহইতে জাগতিক ব্যাপারের সমুদায়ই সিদ্ধ করিয়াছেন। স্পেন্সরের সকল কথাগুলি প্রামাণিক না হইলে হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির কৌশল আশ্চর্য্য।

এইরূপে যে বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে, এমত কোন নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। অন্য কোন প্রকারে, যে সৃষ্টি হয় নাই, তাহার কোন নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। তবে লাপ্লাসের মতে

প্রমাণ বিরুদ্ধও কিছু নাই।* অসম্ভব কিছু নাই। এ মত সম্ভব, সঙ্গত—অতএব ইহা প্রমাণের অতীত হইলেও গ্রাহ্য।

এই মত প্রকৃত হইলে, স্বীকার করিতে হয় যে আদৌ পৃথিবী ছিল না। সূর্য্যাঙ্গ হইতে পৃথিবী বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পৃথিবী যখন বিক্ষিপ্ত হয়, তখন ইহা বাষ্পরাশি মাত্র—নহিলে বিক্ষিপ্ত হইবে না। অতএব পৃথিবীর প্রথমাবস্থা, উত্তপ্ত বাষ্পীয় গোলক।

একটি উত্তপ্ত বাষ্পীয় গোলক—আকাশ পথে বহুকাল বিচরণ করিলে কি হইবে? প্রথমে তাহার তাপহানি হইবে। যেখানে তাপের আধার মাত্র নাই—সেখানে তাপ লেশ নাই; তাহা অচিন্তনীয় শৈত্য বিশিষ্ট।

---

* কোমৎ, মিল, স্পেন্সর প্রভৃতি এই মত অনুমোদন করেন। সর জন হর্শেল বলেন, এ মত প্রমাণ বিরুদ্ধ।

আকাশে তাপাধার কিছু নাই—অতএব আ-
কাশমার্গ অচিন্তনীয় শৈত্য বিশিষ্ট। এই
শৈত্য বিশিষ্ট আকাশে বিচরণ করিতে করিতে
তপ্ত বাষ্পীয় গোলকের অবশ্য তাপক্ষয় হ-
ইবে। তাপক্ষয় হইলে কি হইবে?

জলের উত্তপ্ত বাষ্প সকলেই দেখিয়াছেন।
সকলেই দেখিয়াছেন যে ঐ বাষ্প শীতল হ-
ইলে জল হয়। আরও শীতল হইলে, জল
বরফ হয়। সকল পদার্থের এই নিয়ম।
যাহা উত্তপ্ত অবস্থায় বাষ্পাকৃত, তাপক্ষয়ে
তাহা গাঢ়তা এবং কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়। অত-
এব বাষ্পীয় গোলকাকৃতা পৃথিবীর তাপক্ষয়
হইলে, কালে তাহা এক্ষণকার গাঢ়তা এবং
কঠিনাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

পৃথিবী কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াও কিছুকাল
অগ্নিতপ্ত ছিল বিবেচনা হয়। অপেক্ষাকৃত

শীতলতা ঘটিলেই কঠিনতা জন্মিবে, কিন্তু কঠিনতা জন্মিলেই তাহার সঙ্গে জীবাবাস-যোগ্য শীতলতা ছিল বিবেচনা করা যায় না। সেও কালে ঘটিয়াছিল। তাপক্ষতি হেতু যে শীতলতা, তাহা উপরিভাগেরই প্রথমে ঘটে, উপরি ভাগ শীতল হইলেও, ভিতর তপ্ত থাকে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে অদ্যাপি বিষম তাপ আছে। ভূতত্ত্ববিদেরা ইহা পুনঃ পুনঃ প্রমাণীকৃত করিয়াছেন।

সেই উত্তপ্ত আদিমাবস্থায়, পৃথিবীতলে কোন জীব বা উদ্ভিদের বাসের সম্ভাবনা ছিল না। উত্তপ্ত বাষ্পীয় গোলক জীবাবাসোপ-যোগী শীতলতা এবং কঠিনতা প্রাপ্ত হইতে লক্ষ লক্ষ যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই—কেননা আমাদের দুধের বাটী জুড়া-ইতে যে কালবিলম্ব হয়, তাহাতেই আমাদের

স্থৈর্য্যচ্যুতি জন্মে। অতএব পৃথিবীর উৎপত্তির লক্ষ লক্ষ যুগ পরেও জীব বা উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় নাই।

যাঁহারা ভূতত্ত্বের কিছুমাত্র জানেন, তাঁহারাও অবগত আছেন, যে পৃথিবীর উপরে নানা বিধ মৃত্তিকা এবং প্রস্তর স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত আছে। এইরূপ স্তর সন্নিবেশ কিয়দ্দূর মাত্র পাওয়া যায়, তাহার পরে যে সকল প্রস্তর পাওয়া যায়, তাহা স্তরত্ব শূন্য।

নীচে স্তরত্বশূন্য প্রস্তর, তদুপরি স্তরে স্তরে নানাবিধ প্রস্তর, গৈরিক বা মৃত্তিকা। এই সকল স্তরনিবদ্ধ প্রস্তর, গৈরিক বা মৃত্তিকাভ্যন্তরে এমত অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, যে তাহা এক কালে সমুদ্রতলে ছিল। এমন কি অনেকগুলি স্তর কেবল ক্ষুদ্র২ সমুদ্রচর

জীবের শরীরের সমষ্টি মাত্র। চাখড়ি নামে যে গৈরিক বা প্রস্তর প্রচলিত, তাহা ইউরোপ খণ্ডের অধিকাংশের এবং আসিয়ার কিয়দংশের নিম্নে স্তরনিবদ্ধ আছে। এক্ষণে বর্ত্তমান অনেকগুলি পর্ব্বত কেবল চাখড়ি। এই চাখড়ি কেবল এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুদ্রতলচর জীবের (Globigerinae) মৃত দেহের সমষ্টি মাত্র।

অতএব এই সকল গৈরিকস্তর এক কালে সমুদ্রতলস্থ ছিল। ভূভাগের কোন স্থান কখন সমুদ্রতলস্থ হইতেছে; আবার কাল সহকারে সমুদ্র সে স্থান হইতে সরিয়া যাইতেছে; সমুদ্রতল শুষ্ক ভূমিখণ্ড হইতেছে। ভূগর্ব্ভস্থ রুদ্ধবায়ু, বা অন্য কারণে কোথাও ভূমি কাল সহকারে উন্নত, কালসহকারে অবনত হইতেছে। যেখানে ভূমি উন্নত হইল, সেখান

হইতে সমুদ্র সরিয়া গেল, যেখানে অবনত হইল, তাহার উপরে সাগরজলরাশি আসিয়া পড়িল। তাহার উপরে সমুদ্রবাহিত মৃত্তিকা, জীবদেহাদি পতিত হইয়া একটী নূতন স্তর সৃষ্ট হইল। মনে কর, আবার কালে, সমুদ্র সরিয়া গেল—সমুদ্রের তল শুষ্ক ভূমি হইল—তাহার উপর বৃক্ষাদি জন্মিয়া—জীবসকল জন্ম গ্রহণ করিয়া বিচরণ করিল। আবার যদি কখন উহা সমুদ্র গর্ত্তস্থ হয়, তবে তদুপরি নূতন স্তর সংস্থাপিত হইবে, এবং তথায় যে সকলজীব বিচরণ করিত, তাহাদিগের দেহাবশেষ সেই স্তরে প্রোথিত হইবে। জীবের অস্থি ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না—কিন্তু অতি দীর্ঘকাল প্রোথিত থাকিলে একরূপ প্রস্তরত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অস্থ্যাদিকে "ফসিল" বলা যায়। পাতুরিয়া কয়লা, ফসিল কাষ্ঠ।

যে কয়টী কথা উপরে বলিলাম তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে

১। সর্ব্বনিম্নে স্তরত্বশূন্য প্রস্তর। তদুপরি অন্যান্য গৈরিকাদি স্তরে স্তরে সন্নিবিষ্ট।

২। স্তর*পরম্পরা, সাময়িক সম্বন্ধ বিশিষ্ট। যে স্তরটি নিম্নে, সেটি আগে, যেটি তাহার উপরে, সেটি তাহার পরে হইয়াছে।

৩। যে স্তরে যে জীবের ফসিল অস্থি পাওয়া যায়, সেই স্তর যখন শুষ্ক ভূমি বা জলতল ছিল, তখন সেই জীব বর্ত্তমান ছিল। যদি কোন স্তরে কোন জীব বিশেষের ফসিল একেবারে পাওয়া না যায়, তবে সেই স্তর সৃজনকালে সেই জীব ছিল না।

৪। যদি কোন স্তরে ক নামক জীবের ফসিল পাওয়া যায়, খ নামক জীবের ফসিল পাওয়া যায় না; তাহার উপরিস্থ কোন স্তরে

যদি ঐ খ নামক জীবের ফসিল পাওয়া যায়, তবে সিদ্ধ হইতেছে খ নামক জন্তু ক নামক জন্তুর পরে সৃষ্ট।

সর্ব্ব নিম্নস্থ স্তরত্বশূন্য প্রস্তরে কোন ফসিল ছিল না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে, যে পৃথিবীর প্রথম ভূমিতে কোন জীব বিচরণ করে নাই। তখন পৃথিবী জীব শূন্য ছিল।

যখন প্রথম স্তরমধ্যে জীবদেহের ফসিল দেখা যায়, তখন মনুষ্যেয় অবস্থানের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। মনুষ্য দূরে থাকুক, কোন বৃহৎ বা ক্ষুদ্র চতুষ্পাদ জন্তুর ফসিল পাওয়া যায় না। মৎস্য বা সরীসৃপের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। যে সকল ক্ষুদ্র কীটাদি-বৎ জীবের দেহাবশেষ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শম্বুকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অতএব আদিম জীব লোকে শম্বুকেরা প্রভু ছিল।

তৎপরে মৎস্য দেখা দিল। ক্রমে উপরে উঠিতে সরীস্থপ জাতীয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালীয় সরীস্থপ, অতি ভয়ঙ্কর, তাদৃশ বিচিত্র, বৃহৎ এবং ভয়ঙ্কর সরীস্থপ এক্ষণে পৃথিবীতে নাই। সরীস্থপের রাজ্যের পরে, স্তন্যপায়ী জীবের দেখা পাওয়া যায়। ক্রমে নানাবিধ, হস্তী ঋক্ষ, গণ্ডার, সিংহ, হরিণ জাতীয় প্রভৃতি দেখা যায়, তথাপি মনুষ্য দেখা যায় না। মনুষ্যের চিহ্ন কেবল সর্ব্বোর্দ্ধ স্তরে, অর্থাৎ আধুনিক মৃত্তিকায়। তন্নিম্নস্থ অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরেও কদাচিৎ মনুষ্যের চিহ্ন পাওয়া যায়। অতএব মনুষ্যের সৃষ্টি সর্ব্বশেষে; মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক জীব।*

*এ কথায় এমত বুঝায় না, যে মনুষ্যের পর কোন জীবের উৎপত্তি হয় নাই। বোধ হয়, বিড়াল মনুষ্যের কনিষ্ঠ।

"আধুনিক" শব্দে এস্থলে কি বুঝায় তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। যে সকল স্তরের কথা বলিলাম, সে গুলির সমবায়, পৃথিবীর ত্বগের স্বরূপ। একটি স্তরের উৎপত্তি ও সমাপ্তিতে কত লক্ষ বৎসর, কত কোটি বৎসর লাগিয়াছে, তাহা কে বলিবে? তাহা গণনা করিবার উপায় নাই। তবে কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে, যে সে কাল অপরিমিত—বুদ্ধির ধারণার অতীত। সর্ব্বোর্দ্ধ স্তরেই মনুষ্য চিহ্ন, এই কথা বলিলে, এমত বুঝায় না, যে বহু সহস্র বৎসর মনুষ্য পৃথিবীবাসী নহে। তবে পৃথিবীর বয়ঃক্রমের সঙ্গে তুলনা করিলে বোধ হয়; মনুষ্যের উৎপত্তি এই মুহূর্ত্তে হইয়াছে। এই জন্য মনুষ্যকে আধুনিক জীব বলা যাইতেছে।

মিসরদেশের রাজাবলীর যেসকল তালিকা

প্রচলিত আছে, তাহাতে যদি বিশ্বাস করা যায়, তবে মিশরদেশে দশ সহস্র বৎসরাবধি রাজশাসন প্রচলিত আছে। হোমর, খ্রীষ্টের নয়শত বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী বিদিত মহাকাব্যদ্বয় রচনা করেন; ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। হোমরের গ্রন্থে মিসরের রাজধানী শতদ্বার বিশিষ্টা থিবস্ নগরীর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। মনুষ্যজাতি সভ্যাবস্থায় একবার উন্নতির পথে পদার্পণ করিলে, উন্নতি শীঘ্র শীঘ্র লাভ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু অসভ্যদিগের স্বতঃ সম্পন্ন যে উন্নতি তাহা অচিন্তনীয় কাল বিলম্বে ঘটিয়া থাকে। ভারতীয় বন্যজাতিগণ চারি সহস্র বৎসর সভ্যজাতির প্রতিবেশী হইয়াও বিশেষ কিছু উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। অতএব সহজে বুঝিতে পারা যায় যে মিসরদেশে সভ্যতা স্বতঃ জন্মিয়া

যেকালে, শতদ্বার বিশিষ্টা নগরী সংস্থাপনে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ বহু সহস্র বৎসর। মিসরতত্ত্বজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন, যে মেম্ফিজ প্রভৃতি নগরী থিব্‌স্ হইতে প্রাচীনা। এই সকল নগরীতে যে দেবালয়াদি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহাতে যুদ্ধজয়াদির উৎসবের প্রতিকৃতি আছে। সর জর্জ কর্ণওয়াল লুইস বলেন ঐতিহাসিক সময়ে মিসর দেশীয়দিগকে কখন যুদ্ধপরায়ণ দেখা যায় না। অথচ কোন কালে তাহারা যুদ্ধপরায়ণ না থাকিলে, তন্নির্ম্মিত মন্দিরাদিতে যুদ্ধ জয়োৎসবের প্রতিকৃতি থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব বিবেচনা করিতে হইবে যে ঐতিহাসিক কালের পূর্ব্বেই মিসর দেশীয়েরা এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, যে প্রকাণ্ড মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া জাতীয় কীর্ত্তি সকল তাহাতে চিত্রিত

করিত। অসভ্যজাতি কেবল আপন প্রতি-
ভাকে সহায় করিয়া যে এত দূর উন্নতি লাভ
করে অনেক সহস্র বৎসরের কাজ। তাহার
পর ঐতিহাসিক কাল অনেক সহস্র বৎসর।
অতএব বহু সহস্র বৎসর হইতে মিসরদেশে
মনুষ্যজাতি সমাজ বদ্ধ হইয়া বাস করি-
তেছে। সে দশ সহস্র বৎসর,কি ততোধিক,
কি তাহার কিছু নূন্য তাহা বলা যায় না।

মিসরদেশ নীলনদী নির্ম্মিত। বৎসর
বৎসর নীলনদীর জলে আনীত কর্দ্দমরাশিতে
এই দেশ গঠিত হইয়াছে। থীব্‌স্ মেম্ফিজ
প্রভৃতি নগরী নীলনদী পলির উপর স্থাপিত
হইয়াছিল। এই নদী কর্দ্দম নির্ম্মিত প্রদেশ
১৮৫১ও১৮৫৪ সালে রাজব্যয়ে সুযোগ্য তত্ত্বা-
বধারকের তত্ত্বাবধারণায় নিখাত হইয়াছিল।
নানা স্থানে খনন করা যায়। যেখানে খনন

করা হইয়া গিয়াছিল, সেইখান হইতেই ভগ্ন মৃৎপাত্র, ইষ্টকাদি উঠিয়াছিল। এমন কি ষাট ফিট নীচে হইতে ইষ্টক উঠিয়াছিল। সকল স্থানে এইরূপ ইষ্টকাদি পাওয়াগিয়াছিল, অতএব ঐ সকল ইষ্টক পূর্ব্বতন কূপাদি নিহিত বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। এই সকল খনন কার্য্য হেকেকিয়ান বে নামক একজন সুশিক্ষিত আরমাণি জাতীয় কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধারণায় হইয়াছিল। লিনাণ্টবে নামক অপর একজন কর্ম্মচারী ৭২ফিট নিম্নে ইষ্টক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মস্যুর গিরার্ড অনুমান করেন যে নীলের কর্দ্দম, শত বৎসরে পাঁচ ইঞ্চি মাত্র নিক্ষিপ্ত হয়। যদি শত বৎসরে পাঁচ ইঞ্চিও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহাহইলে হেকেকিয়ান ৬০ফিট নীচে যে ইট পাইয়াছিলেন, তাহার বয়ঃক্রম

অন্যূন দ্বাদশ সহস্র বৎসর। মস্যুর রজীর হিসাব করিয়া বলিয়াছেন, যে নীলের কাদা শত বৎসরে ২।০ ইঞ্চি মাত্র জমে। যদি এ কথা সত্য হয় তবে, লিনাণ্টবের ইষ্টকের বয়স্ ত্রিশ হাজার বৎসর।

অতএব যদি কেহ বলেন, যে ত্রিশ হাজার বৎসরেরও অধিক কাল মিসরে মনুষ্যের বাস তবে তাঁহার কথা নিতান্ত প্রমাণশূন্য বলা যায় না।

মিসরে যেখানে, যত দূর খনন করাগিয়াছে, সেইখানেই, পৃথিবীস্থ বর্ত্তমান জন্তুর অস্থ্যাদি ভিন্ন লুপ্ত জাতির অস্থ্যাদি কোথাও পাওয়া যায় নাই। অতএব যে সকল স্তর মধ্যে লুপ্ত জাতির অস্থ্যাদি পাওয়া যায়, তদপেক্ষা এই নীল কর্দ্দমস্তর অত্যন্ত আধুনিক। আর যদি সেই সকল লুপ্ত জন্তুর দেহাবশেষ বিশিষ্ট

স্তর মধ্যে মনুষ্যের তৎসহ সমসাময়িকতার চিহ্ন পাওয়া যায়, তবে কত সহস্র বৎসর পৃথিবীতল মনুষ্যের আবাসভূমি কে তাহার পরিমাণ করিবে?

এরূপ সমসাময়িকতার চিহ্ন ফ্রান্স ও বেল্জ্যমে পাওয়া গিয়াছে।

জৈবনিক।

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, এবং আকাশ, বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে ভৌতিক সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহারাই পঞ্চভূত—আর কেহ ভূত নহে। এক্ষণে ইউরোপ হইতে নূতন বিজ্ঞান শাস্ত্র আসিয়া তাঁহাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছেন। ভূত বলিয়া আর

কেহ তাঁহাদিগকে বড় মানে না। নূতন বি-
জ্ঞান শাস্ত্র বলেন, আমি বিলাত হইতে নূতন
ভূত আনিয়াছি, তোমরা আবার কে? যদি
ক্ষিত্যাদি জড়সড় হইয়া বলেন, যে আমরা
প্রাচীন ভূত, কনাদকপিলাদির দ্বারা ভৌতিক
রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রতি জীবশরীরে বাস
করিতেছি, বিলাতী বিজ্ঞান বলেন, তোমরা
আদৌ ভূত নও। আমরা "Elementary Subs-
tances" দেখ—তাহারাই ভূত; তাহার মধ্যে
তোমরা কই! তুমি, আকাশ, তুমি কেহই নও
—সম্বন্ধ বাচক শব্দমাত্র। তুমি, তেজঃ, তুমি
কেবল একটি ক্রিয়া,—গতি বিশেষ মাত্র।
আর, ক্ষিতি, অপ্, মরুৎ, তোমরা এক একজন
দুই তিন বা ততোধিক ভূতে নির্ম্মিত। তো-
মরা আবার কিসের ভূত? সিংহাসন ছাড়!
আমার সাতষট্টি পুত্তলী উহাতে বসাইব?

যদি ভারতবর্ষ, এমন সহজে ভূতছাড়া হইত তবে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এখনও অনেকে পঞ্চভূতের প্রতি ভক্তিবিশিষ্ট। বাস্তবিক ভূত ছাড়াইলে একটু বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। ভূতবাদীরা বলিবেন যে যদি ক্ষিত্যাদি ভূত নহে, তবে আমাদিগের এশরীর কোথা হইতে? কিসে নির্ম্মিত হইল? নূতন বিজ্ঞান বলেন, যে “তোমাদের পুরাণ কথায় একেবারে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহি না। জীবশরীরের একটি প্রধান ভাগ যে জল, ইহা অবশ্য স্বীকার করিব। আর মরুতের সঙ্গে শরীরের একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে, —এমনকি শরীরের বায়ুকোষে বায়ু না গেলে প্রাণের ধ্বংস হয়, ইহাও স্বীকার করি। তেজঃ সম্বন্ধে ইহা স্বীকার করিতে তোমাদের বৈশেষিকেরা যে জঠরাগ্নি কল্পনা করিয়াছেন, তাহার

অস্তিত্ব আমার লিবিগ অতি সুকৌশলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আর যদি সন্তাপকেই তেজঃ বল, তবে মানি যে ইহা জীবদেহে অহরহঃ বিরাজ করে, ইহার লাঘব হইলে প্রাণের ধ্বংস হয়। সোডা পোতাস প্রভৃতি পৃথিবী বটে, তাহা অত্যল্প পরিমাণে শরীরমধ্যে আছে। আর আকাশ ছাড়া কিছুই নাই, কেন না আকাশ সম্বন্ধজ্ঞাপক শব্দ মাত্র। অতএব শরীরে পঞ্চভূতের অস্তিত্ব এপ্রকারে স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমার প্রধান আপত্তি তিনটি। প্রথম, শরীরের সারাংশ এ সকলে নির্ম্মিত নহে; এ সকল ভিন্ন অন্য অনেক প্রকার উপকরণ আছে। দ্বিতীয়, ইহাদের ভূত বল কেন? তৃতীয়, ইহার সঙ্গে প্রাণাপানাদি বায়ু প্রভৃতি যে কতক গুলি কথা বল, বোধহয়, হিন্দু রাজাদিগের আমলে আবকারির আ-

ইন প্রচলিত থাকিলে, সে কথাগুলির প্রচার হইত না।”

“দেখ, এই তোমার সম্মুখে ইষ্টক নির্ম্মিত মনুষ্যের বাসগৃহ। ইহা ইষ্টকনির্ম্মিত, সুতরাং ইহাতে পৃথিবী আছে। গৃহস্থ ইহাতে পানাদির জন্য কলসী কলসী জল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। পাকার্থ, এবং আলোকের জন্য, অগ্নি জ্বালিয়াছে, সুতরাং তেজও বর্ত্তমান। আকাশ, গৃহমধ্যে সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান; সর্ব্বত্র বায়ু যাতায়াত করিতেছে। সুতরাং এ গৃহও পঞ্চভূতনির্ম্মিত? তুমি যেমন বল, মনুষ্যের এস্থানে প্রাণ বায়ু, ওস্থানে অপান বায়ু, ইত্যাদি, আমিও তেমনি বলিতেছি, এই দ্বার পথে যে বায়ু বহিতেছে, তাহা প্রাণবায়ু, ও বাতায়ন পথে যাহা বহিতেছে, তাহা অপান বায়ু ইত্যাদি। তোমারও নির্দ্দেশ যেমন

অমূলক ও প্রমাণশূন্য, আমার নির্দ্দেশ তেমনি প্রমাণশূন্য। তুমি জীব শরীর সম্বন্ধে যাহা বলিবে, আমি এই অট্টালিকা সম্বন্ধে তাহাই বলিব। তুমি যদি আমার কথা অপ্রমাণ করিতে যাও, তোমার স্বপক্ষের কথাও অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। তবে কি, তুমি আমার এই অট্টালিকাটি জীব বলিয়া স্বীকার করিবে?"

প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে এবং আধুনিক বিজ্ঞানে এই প্রকার বিবাদ। ভারতবর্ষবাসীরা মধ্যস্থ। মধ্যস্থেরা তিন শ্রেণীভুক্ত। এক শ্রেণীর মধ্যস্থেরা বলেন, যে "প্রাচীন দর্শন, আমাদের দেশীয়। যাহা আমাদের দেশীয় তাহাই ভাল, তাহাই মান্য এবং যথার্থ। আধুনিক বিজ্ঞান বিদেশী, যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে, সন্ধ্যা আহ্নিক করে না, উহারাই তাহাকে মানে। আমাদের দর্শন সিদ্ধ ঋষিপ্রণীত,

তাঁহাদিগের মনুষ্যাতীত জ্ঞান ছিল, দিব্য চক্ষে সকল দেখিতে পাইতেন কেন না তাঁহারা প্রাচীন এবং এদেশীয়। আধুনিক বিজ্ঞান যাঁহাদিগের প্রণীত, তাঁহারা সামান্য মনুষ্য। সুতরাং প্রাচীন মতই মানিব।"

আর এক শ্রেণীর মধ্যস্থ আছেন, তাঁহারা বলেন, "কোনটি মানিতে হইবে, তাহা জানি না। দর্শনে কি আছে, তাহা জানি না, বিজ্ঞানে কি আছে তাহাও জানি না। কালেজে তোতা পাখীরমত কিছু বিজ্ঞান শিখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা কর কেন সে সব মানি, তবে আমার কোন উত্তর নাই। যদি দুই মানিলে চলে, তবে দুই মানি। তবে, যদি নিতান্ত পীড়া পীড়ি কর, তবে বিজ্ঞানই মানি, কেননা তাহা না মানিলে, লোকে আজি কালি মূর্খ বলে। বিজ্ঞান মানিলে লোকে

বলিবে এ ইংরেজি জানে, সে গৌরব ছাড়িতে পারি না। আর, বিজ্ঞান মানিলে বিনা কষ্টে হিন্দুয়ানির বাঁধাবাঁধি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সে অল্প সুখ নহে। সুতরাং বিজ্ঞা-নই মানিব।"

তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যস্থেরা বলেন, "প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র দেশী বলিয়া তৎপ্রতি আমাদিগের বিশেষ প্রীতি বা অপ্রীতি নাই। আধুনিক বিজ্ঞান সাহেবি বলিয়া তাহাকে ভক্তি বা অ-ভক্তি করি না। যেটি যথার্থ হইবে তাহাই মানিব—ইহাতে কেহ খ্রীষ্টান, বা কেহ মূর্খ বলে, তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না। কোন্‌টি যথার্থ, কোন্‌টি অযথার্থ তাহা মীমাংসা করিবে কে? আমরা আপনার বুদ্ধিমত মীমাংসা ক-রিব;—পরের বুদ্ধিতে যাইব না। দার্শনি-কেরা আমাদিগের দেশী লোক বলিয়া তাঁহা-

দিগকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করিব না—ইংরেজেরা রাজা বলিয়া তাঁহাদিগকে অভ্রান্ত মনে করি না। "সর্ব্বজ্ঞ" বা "সিদ্ধ" মানি না; আধুনিক মনুষ্যাপেক্ষা প্রাচীন ঋষিদিগের কোন প্রকার বিশেষ জ্ঞানের উপায় ছিল, তাহা মানি না—কেন না যাহা অনৈসর্গিক তাহা মানিব না। বরং ইহাই বলি, যে প্রাচীনাপেক্ষা আধুনিকদিগের অধিক জ্ঞানবত্তার সম্ভাবনা। কেন না, কোন বংশে যদি পুরুষানুক্রমে সকলেই কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া যায়, তবে প্রপিতামহ অপেক্ষা প্রপৌত্র ধনবান্ হইবে সন্দেহ নাই। তবে, আপনার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে এ সকল গুরুতর তত্ত্বের মীমাংসা করিব কিপ্রকারে? প্রমাণানুসারে। যিনি প্রমাণ দেখাইবেন, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিব। যিনি কেবল আনুমানিক কথা বলিবেন,

তাহার কোন প্রমাণ দেখাইবেন না, তিনি পিতৃ পিতামহ হইলেও তাঁহার কথায় অশ্রদ্ধা করিব। দার্শনিকেরা, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলেন, ক হইতে খ হইয়াছে, গরমধ্যে ঘ আছে, ইত্যাদি। তাঁহারা তাহার কোন প্রমাণ নির্দ্দেশ করেন না; কোন প্রমাণের অনুসন্ধান করিয়াছেন, এমত কথা বলেন না, সন্ধান করিলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি কখন প্রমাণ নির্দ্দেশ করেন, সে প্রমাণও আনুমানিক বা কাল্পনিক, তাহার আবার প্রমাণের প্রয়োজন; তাহাও পাওয়া যায় না। অতএব আজন্ম মূর্খ হইয়া থাকিতে হয়, সেও ভাল, তথাপি দর্শন মানিব না। এদিকে বিজ্ঞান আমাদিগকে বলিতেছেন, "আমি তোমাকে সহসা বিশ্বাস করিতে বলি না, যে সহসা বিশ্বাস করে, আমি তাহার

প্রতি অনুগ্রহ করি না; সে যেন আমার কাছে আইসে না। আমি যাহা তোমার কাছে প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিব, তুমি তাহাই বিশ্বাস করিও, তাহার তিলার্দ্ধ অধিক বিশ্বাস করিলে তুমি আমার ত্যজ্য। আমি যে প্রমাণ দিব, তাহা প্রত্যক্ষ। একজনে সকল কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, এজন্য কতকগুলি তোমাকে অন্যের প্রত্যক্ষের কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু যেটিতে তোমার সন্দেহ হইবে, সেইটি তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিও। সর্ব্বদা আমার প্রতি সন্দেহ করিও। দর্শনের প্রতি সন্দেহ করিলেই, সে ভস্ম হইয়া যায়, কিন্তু সন্দেহেই আমার পুষ্টি। আমি, জীবশরীর সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি, আমার সঙ্গে শবচ্ছেদ গৃহে, ও রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় আইস। সকলই প্রত্যক্ষ দেখাইব।" এইরূপ অভি-

হিত হইয়া, বিজ্ঞানের গৃহে গিয়া সকলই প্রমাণসহিত দেখিয়া আসিয়াছি। সুতরাং বিজ্ঞানেই আমাদের বিশ্বাস।"

যাঁহারা এই সকল কথা শুনিয়া কুতূহল বিশিষ্ট হইবেন; তাঁহারা বিজ্ঞান মাতার আজ্ঞানুসারে তাঁহার শবচ্ছেদ গৃহে এবং রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় গিয়া দেখুন, পঞ্চ ভূতের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে। জীব শরীরের ভৌতিক-তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যদি দুই একটা কথা বলিয়া রাখি, তবে তাঁহাদিগের পথ একটু সুগম হইবে।

বিষয় বাহুল্য ভয়ে কেবল একটি তত্ত্বই আমরা সংক্ষেপে বুঝাইব। আমরা অনুমান করিয়া রাখিলাম—যে পাঠক, জীবের শারীরিক নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। গঠনের কথা বলিব না—গঠনের সামগ্রীর কথা বলিব।

একবিন্দু শোণিত লইয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা কর। তাহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র২ চক্রাকার বস্তু দেখিবে। অধিকাংশই রক্ত-বর্ণ, এবং সেই চক্রাণুসমূহের বর্ণ হেতুই শোণি-তের বর্ণ রক্ত, তাহাও দেখিবে। তন্মধ্যে, মধ্যে,২ আর কতকগুলি দেখিবে, তাহা রক্ত-বর্ণ নহে,—বর্ণহীন, রক্তচক্রাণু হইতে কিঞ্চিৎ বড়, প্রকৃত চক্রাকার নহে—আকারের কোন নিয়ম নাই। শরীরাভ্যন্তরে, যে তাপ, পরী-ক্ষ্যমাণ রক্তবিন্দু যদি সেই রূপ তাপ সংযুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, এই বর্ণহীন চক্রাণু সকল সজীব পদার্থের ন্যায় আচরণ করিবে। আপনারা যথেচ্ছা চলিয়া বেড়াইবে, আকার পরিবর্ত্তন করিবে, কখন কোন অঙ্গ বাড়াইয়া দিবে, কখন কোন ভাগ সঙ্কীর্ণ করিয়া লইবে। এইগুলি যে পদার্থের

সমষ্টি, তাহাকে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা প্রোটোপ্লাস্ম্ বা বিত্ত প্লাস্ম্ বলেন। আমরা ইহাকে "জৈবনিক" বলিলাম। ইহাই জীব শরীর নির্ম্মাণের একমাত্র সামগ্রী। যাহাতে ইহা আছে তাহাই জীব, যাহাতে ইহা নাই তাহা জীব নহে। দেখা যাউক, এই সামগ্রীটি কি।

এক্ষণকার বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা অনেকেই দেখিয়াছেন, আচার্য্যেরা বৈদ্যুতীয় যন্ত্র সাহায্যে জল, উড়াইয়া দেন। বাস্তবিক জল উড়িয়া যায় না; জল অন্তর্হিত হয় বটে, কিন্তু তাহার স্থানে দুইটী বায়বীয় পদার্থ পাওয়া যায়—পরীক্ষক সেই দুইটী পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে ধরিয়া রাখেন। সেই দুইটি পুনর্ব্বার একত্রিত করিয়া আগুনদিলে আবার জল হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে এই দুইটি পদা-

র্থের রাসায়নিক সংযোগে জলের জন্ম। ইহার একটির নাম অম্লজান বায়ু; দ্বিতীয়টির নাম জলজান বায়ু।

যে বায়ু পৃথিবী ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহাতেও অম্লজান আছে। অম্লজান ভিন্ন আর একটি বায়বীয় পদার্থও তাহাতে আছে। সেটি যবক্ষারেও আছে, বলিয়া তাহার নাম যবক্ষারজান হইয়াছে। অম্লজান ও যবক্ষারজান সাধারণ বায়ুতে রাসায়নিক সংযোগে যুক্ত নহে। মিশ্রিত মাত্র। যাঁহারা রসায়নবিদ্যা প্রথম শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা শুনিয়া চমৎকৃত হয়েন যে হীরক ও অঙ্গার একই বস্তু। বাস্তবিক এ কথা সত্য, এবং পরীক্ষাধীন। যে দ্রব্য উভয়েরই সার, তাহার নাম হইয়াছে অঙ্গারজান। কাষ্ঠতৃণ তৈলাদি যাহা দাহ করা যায়, তাহার দাহ্যভাগ এই অঙ্গার-

জান। অঙ্গারজানের সহিত অম্লজানের রাসায়নিক যোগ ক্রিয়াকে দাহ বলে। এই চারিটি পদার্থ সর্ব্বদা পরস্পরে রাসায়নিক যোগে সংযুক্ত হয়। যথা, অম্লজানে জলজানে জল হয়। অম্লজানে যবক্ষারজানে নাইট্রিক আসিড নামক প্রসিদ্ধ ঔষধ হয়। অম্লজানে, অঙ্গারজানে আঙ্গারিক অম্ল (কার্ব্বণিক আসিড) হয়। যে বাষ্পের কারণ সোডা ওয়াটার উছলিয়া উঠে, সে এই পদার্থ। দীপশিখা হইতে এবং মনুষ্য নিশ্বাসে ইহা বাহির হইয়া থাকে। যবক্ষারজান এবং জলজানে আমনিয়া নামক প্রসিদ্ধ তেজস্বী ঔষধ হইয়া থাকে। অঙ্গারজান এবং জলজানে তারপিন তৈল প্রভৃতি অনেকগুলি তৈলবৎ এবং অন্যান্য সামগ্রী হয়। ইত্যাদি।

এই চারিটি সামগ্রী যেমন পরস্পরের সহিত রাসায়নিক যোগে যুক্ত হয়, সেইরূপ

অন্যান্য সামগ্রীর সহিত যুক্ত হয় এবং সেই সংযোগেই এই পৃথিবী নির্ম্মিত। যথা সডিয়মের সঙ্গে ও ক্লোরাইনের সঙ্গে অম্লজানের সংযোগ বিশেষে লবণ; চূণের সঙ্গে অম্লজান ও অঙ্গারজানের সংযোগ বিশেষে মর্ম্মরাদি নানাবিধ প্রস্তর হয়; সিলিকন এবং আলুমিনার সঙ্গে অম্লজানের সংযোগে নানাবিধ মৃত্তিকা।

দুইটি সামগ্রীর রাসায়নিক সংযোগে যে এক ফল হয় এমত নহে। নানা মাত্রায় নানা দ্রব্যের সংযোগে নানা দ্রব্য হইয়া থাকে।

জলজান, অম্লজান, অঙ্গারজান, এবং যবক্ষারজান, এই চারিটিই একত্রে সংযুক্ত হইয়া থাকে। সেই সংযোগের ফল জৈবনিক। জৈবনিকে এই চারিটি সামগ্রীই থাকে, আর কিছুই থাকে না এমত নহে; অম্লজানাদির সঙ্গে

কখন২ গন্ধক, কখন পোতাস ইত্যাদি সামগ্রী থাকে। কিন্তু যে পদার্থে এই চারিটীই নাই, তাহা জৈবনিক নহে; যাহাতে এই চারিটীই আছে তাহাই জৈবনিক। জীবমাত্রেই এই জৈবনিকে গঠিত; জীব ভিন্ন আর কিছুতেই জৈবনিক নাই। এই স্থলে জীব শব্দে কেবল প্রাণী বুঝাইতেছে এমত নহে। উদ্ভিদ্‌ও জীব, কেন না তাহাদিগেরও জন্ম, বৃদ্ধি, পুষ্টি ও মৃত্যু আছে। অতএব উদ্ভিদের শরীরও জৈবনিকে নির্ম্মিত। কিন্তু সচেতন ও অচেতন জীবে এ বিষয়ে একটু বিশেষ প্রভেদ আছে।

জৈবনিক জীবশরীরমধ্যেই পাওয়া যায়, অন্যত্র পাওয়া যায় না। জীবশরীরে কোথা হইতে জৈবনিক আইসে? জৈবনিক জীবশ-রীরে প্রস্তুত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্ জীব, ভূমি এবং বায়ু হইতে অম্লজানাদি গ্রহণ করিয়া আ-

পন শরীর মধ্যে তৎসমুদায়ের রাসায়নিক সং-
যোগ সম্পাদন করিয়া জৈবনিক প্রস্তুত করে;
সেই জৈবনিকে আপন শরীর নির্ম্মাণ করে।
কিন্তু নির্জ্জীব পদার্থ হইতে জৈবনিক পদার্থ
প্রস্তুত করার যে শক্তি, তাহা উদ্ভিদেরই
আছে। সচেতন জীবের এই শক্তি নাই;
ইহারা স্বয়ং জৈবনিক প্রস্তুত করিতে পারে
না; উদ্ভিদ্‌কে ভোজন করিয়া প্রস্তুত জৈব-
নিক সংগ্রহ পূর্ব্বক শরীর পোষণ করে।
কোন সচেতন জীব মৃত্তিকা খাইয়া প্রাণ ধারণ
করিতে পারে না, কিন্তু তৃণ ধান্য প্রভৃতি সেই
মৃত্তিকার রস পান করিয়া জীবন ধারণ করি-
তেছে, কেন না উহারা তাহা হইতে জৈবনিক
প্রস্তুত করে; বৃষ মৃত্তিকা খাইবে না, কিন্তু
সেই তৃণ ধান্যাদি খাইয়া তাহা হইতে জৈব-
নিক গ্রহণ করিবে, ব্যাঘ্র আবার সেই বৃষকে

খাইয়া জৈবনিক সংগ্রহ করিবে। যাঁহারা এদেশের জমীদারগণের দ্বেষক, তাঁহারা ব-লিতে পারেন, যে উদ্ভিদ্ জীবেরা এ জগতে চাসা, তাহারা উৎপাদন করে; অপরেরা জমী-দার, তাহারা চাসার উপার্জ্জন কাড়িয়া খায়, আপনারা কিছু করে না।

এখন দেখ, এক জৈবনিকে সর্ব্বজীব নি-র্ম্মিত। যে ধান ছড়াইয়া তুমি পাখীকে খা-ওয়াইতেছ, সে ধান যে সামগ্রী, পাখীও সেই সামগ্রী, তুমিও সেই সামগ্রী। যে কুসুম, ঘ্রাণ মাত্র লইয়া, লোকমোহিনী সুন্দরী ফে-লিয়া দিতেছেন, সুন্দরীও যাহা, কুসুমও তাই। কীটও যাহা, সম্রাট্ও তাই। যে হংসপুচ্ছ লেখনীতে আমি লিখিতেছি সেও যাহা আ-মিও তাই। সকলই জৈবনিক। প্রভেদও গুরুতর। জয়পুরী শ্বেত প্রস্তরে তোমার

জলপান পাত্র বা ভোজন পাত্র নির্ম্মিত হই-য়াছে; সেই প্রস্তরে তাজমহল এবং জমা মসজিদও নির্ম্মিত হইয়াছে। উভয়ে প্রভেদ নাই কে বলিবে? গোষ্পদেও জল, সমুদ্রেও জল, গোষ্পদে সমুদ্রে প্রভেদ নাই কে ব-লিবে?

কিন্তু স্থূল কথা বলিতে বাঁকি আছে। জৈবনিক ভিন্ন জীবন নাই, যেখানে জীবন সেইখানে জৈবনিক তাহার পূর্ব্বগামী। "অ-ন্যথা সিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ববর্ত্তিতা কার-ণত্বং" এ কথা যদি সত্য হয়, তবে জৈবনিকই জীবনের কারণ। জৈবনিক ভিন্ন জীবন কু-ত্রাপি সিদ্ধ নহে, এবং জৈবনিক জীবনের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী বটে। অতএব আমাদের এই চঞ্চল, সুখদুঃখবহুল, বহু স্নেহাস্পাদ জীবন, কেবল জৈবনিকের ক্রিয়া, রাসায়নিক

সংযোগসমবেত জড় পদার্থের ফল। নিউ-টনের বিজ্ঞান, কালিদাসের কবিতা, হম্বোল্ট্ বা শঙ্করাচার্য্যের পাণ্ডিত্য—সকলই জড় পদা-র্থের ক্রিয়া; শাক্যসিংহের ধর্ম্মজ্ঞান, আকব-রের শৌর্য্য, কোমতের দর্শনবিদ্যা সকলই জড়ের গতি। তোমার বনিতার প্রেম, বাল-কের অমৃত ভাষা, পিতার সদুপদেশ—সক-লই জড়পদার্থের আকুঞ্চন সম্প্রসারণ মাত্র—জৈবনিক ভিন্ন ভিতরে আর ঐন্দ্রজালিক কেহ নাই। যে যশের জন্য তুমি প্রণিপাত করি-তেছ, সে এই জৈবনিকের ক্রিয়া—যেমন স-মুদ্রগর্জ্জন এক প্রকার জড়পদার্থকৃত কোলা-হল, যশ তেমনি জড়পদার্থকৃত অন্য প্রকার কোলাহল মাত্র। এই সর্ব্বকর্ত্তা জৈবনিক অম্লজান, জলজান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষার-জানের রাসায়নিক সমষ্টি। অতএব এই ঢা-

রিটি ভৌতিক পদার্থই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সর্ব্ব কর্ত্তা। ইহারা প্রকৃত ভূত, এবং এই ভূতের কাণ্ড সকল আশ্চর্য্য বটে। পাঠক দেখিবেন, যে আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত পঞ্চভূত হইতে এই আধুনিক ভূতগণের যে প্রভেদ তাহা কেবল প্রমাণগত। নচেৎ উভয়েরই ফল প্রকৃতিবাদ (Materialism) সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ হইতে আধুনিক প্রকৃতিবাদের প্রভেদ, প্রধানতঃ প্রমাণগত। তবে আধুনিক বলেন, ক্ষিত্যাদি ভূত নহে, আমাদিগের পরিচিত এই ভূত গুলিই ভূত। যেই ভূত হউক তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই,—কেন না মনুষ্যজাতি ভূত ছাড়া হইল না। যুবেনল্ হইতে কার্লাইল পর্য্যন্ত অনেকে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন—গালি দিয়াও মনুষ্যজাতির ভূত ছাড়াইতে পারেন নাই।

পরিমাণরহস্য

আমাদিগের সকল ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা চক্ষুর উপর বিশ্বাস অধিক,। কিছুতে যাহা বিশ্বাস না করি, চক্ষে দেখিলেই তাহাতে বিশ্বাস হয়। অথচ চক্ষের ন্যায় প্রবঞ্চক কেহ নহে। যে সূর্য্যের পরিমাণ লক্ষ২ যোজনে হয় না, তাহাকে একখানি স্বর্ণথালির মত দেখি। প্রকাণ্ড বিশ্বকে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখি। যে চন্দ্রের দূরতা সূর্য্যের দূরতার চারি শত ভাগের এক ভাগও নহে, তাহা সূর্য্যের সমদূরবর্ত্তী দেখায়। যে পরমাণুতে এই জগৎ নির্ম্মিত তাহার একটিও দেখিতে পাই না। আনুবীক্ষণিক জীব জৈবনিকাদি কিছুই দেখিতে পাই না। এই অবিশ্বাস যোগ্য চক্ষুকেই আমাদের বিশ্বাস।

দর্শনেন্দ্রিয়ের এইরূপ শক্তিহীনতার গতিকে আমরা জগতের পরিমাণবৈচিত্র্য কিছুই বুঝিতে পারি না। জ্যোতিষ্কাদি অতি বৃহৎ পদার্থকে ক্ষুদ্র দেখি, এবং অতি ক্ষুদ্র পদার্থ সকলকে একেবারে দেখিতে পাই না। ভাগ্যক্রমে, মন বাহ্যেন্দ্রিয়াপেক্ষা দূরদর্শী; অদর্শনীয়ও বিজ্ঞান দ্বারা মিত হইয়াছে। সে পরিমাণ অতি বিস্ময়কর। দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

সকলে জানেন যে পৃথিবীর ব্যাস ৭০-৯১ মাইল। যদি পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ এক মাইল প্রস্থ, এমত খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা যায়, তাহাহইলে উনিশ কোটি ছয়ষট্টি লক্ষ, ছাব্বিশ হাজার এইরূপ বর্গ মাইল পাওয়া যায়। এক মাইল দীর্ঘ, এক মাইল প্রস্থে, এবং এক মাইল উর্দ্ধে এরূপ ২৫৯,৮০০,০০০,০০০ ঘন

মাইল পাওয়া যায়। ওজনে পৃথিবী যত টন হইয়াছে, তাহা নিম্নে অঙ্কের দ্বারা লিখিলাম। ৬,০৬৯,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০। এক টন সাতাইশ মনের অধিক।*

এই আকার কি ভয়ানক, তাহা মনে কল্পনা করা যায় না। সমগ্র হিমালয় পর্ব্বত ইহার নিকট বালুকাকণার অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। কিন্তু এই প্রকাণ্ড পৃথিবী সূর্য্যের আকারের সহিত তুলনায়, বালুকা মাত্র। চন্দ্র একটি প্রকাণ্ড উপগ্রহ, উহা পৃথিবী হইতে ২৪০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্য্য এ প্রকার প্রকাণ্ড পদার্থ, যে তাহা অন্তঃশূন্য করিয়া পৃথিবীকে চন্দ্রসমেত তাহার মধ্যস্থলে স্থাপিত করিলে, চন্দ্র এখন যেরূপ দূরে থাকিয়া পৃথিবীর পার্শ্বে বর্ত্তন করে, সূর্য্যগর্ভেও সেইরূপ করিতে

* আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত দেখ।

পারে, এবং চন্দ্রের বর্ত্তনপথ ছাড়াও এক লক্ষ ষাট হাজার মাইল বেশী থাকে।

সূর্য্যর দূরতা কত মাইল, তাহা বালকে-ও জানে, কিন্তু সেই দূরতা অনুভূত করিবার জন্য, নিম্ন লিখিত গণনা উদ্ধৃত করিলাম।

"অস্মদাদির দেশে রেইলওয়ে ট্রেণ ঘণ্টায় ২০ মাইল যায়। যদি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত রেইলওয়ে হইত তবে কত কালে সূর্য্যলোকে যাইতে পারিতাম? উত্তর—যদি দিন রাত্রি, ট্রেণ অবিরত ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, তবে ৫২০ বৎসর ৬ মাস ১৬ দিনে সূর্য্যলোকে পৌঁছান যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ট্রেণে চড়িবে, তাহার সপ্তদশ পুরুষ ঐ ট্রেণেই গত হইবে।"(১)

আর বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি গ্রহ সকলের

(১) আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত দেখ।

দূরতার সহিত তুলনায় এ দূরতাও সামান্য। বুবীর গণনা করিয়া বলিয়াছেন, যে রেইল যদি ঘণ্টায় ৩৩ মাইল চলে, তবে সূর্য্যলোক হইতে কেহ রেইলে যাত্রা করিলে, দিন রাত্র চলিয়া বৃহস্পতি গ্রহে ১৭১২ বৎসরে শনি গ্রহে ৩১১৩ বৎসরে, উরেনসে ৬২২৬ বৎসরে, নেপ্‌চ্যুনে ৯৬৮৫ বৎসরে পৌঁছিবে।

আবার এ দূরতা নক্ষত্র সূর্য্যগণের দূরতার তুলনায় কেশের পরিমাণ মাত্র। সকল নক্ষত্রের অপেক্ষা আল্‌ফা সেণ্টরাই আমাদিগের নিকটবর্ত্তী; তাহার দূরতা ৬১ সিগনাই নামক নক্ষত্রের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ। এই দ্বিতীয় নক্ষত্রের দূরতা ৬৩,৬৫০,০০০,০০০,০০০ মাইল। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৯২,০০০ মাইল। সেই আলোক ঐ নক্ষত্র হইতে আসিতে দশ বৎসরের অধিক কাল

লাগে। বেগা নামক নক্ষত্রের দূরতা ১৩০,০০০ ০০০,০০০,০০০ মাইল; আলোক সেখান হইতে ২১ বৎসরে পৃথিবীতে পৌঁছে। ২১ বৎসর পূর্ব্বে ঐ নক্ষত্রের যে অবস্থা ছিল তাহা আমরা দেখিতেছি—উহার অদ্যকার অবস্থা আমাদিগের জানিবার সাধ্য নাই।

আবার নীহারিকাগণের দূরতার সঙ্গে তুলনায়, এ সকল নক্ষত্রের দূরতা সূত্র পরিমিত বোধ হয়। বীনা (Lyra) নামক নক্ষত্র সমষ্টির বিটা ও গামা নক্ষত্রের মধ্যবর্ত্তী অঙ্গুরীয়বৎ নীহারিকার দূরতা, সর্ উইলিয়ম্ হর্শেলের গণনানুসারে সিরিয়সের দূরতার ৯৫০ গুণ। ঐ বিটা নক্ষত্রের দক্ষিণ পূর্ব্বস্থিত গোলাকৃত নীহারিকা, ঐ মহাত্মার গণনানুসারে সৌরজগৎ হইতে ১,৩০০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল। ত্রিকোণ নামক নক্ষত্র

সমষ্টিস্থিত এক নীহারিকা, সিরিয়সের দূরতার ৩৪৪ গুণ দূরে অবস্থিত; এবং সুবৈঙ্কির ঢাল নামক নক্ষত্র সমষ্টিতে ঘোড়ার নালের আকার যে এক নীহারিকা আছে, তাহার দূরতা উক্ত ভীষণ মানদণ্ডের নয়শত গুণ অর্থাৎ ৫০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইলের কিছু ন্যূন।

পাদরি ডাক্তার স্কোরেস্‌বি বলেন যে যদি আমাদিগের সূর্য্যকে এত দূরে লইয়া যাওয়া যায়, যে তথা হইতে পঁচিশ হাজার বৎসরে উহার আলোক আমাদিগের চক্ষে আসিবে, উহা তথাপি লর্ড রসের বৃহৎ দূরবীক্ষণে দৃশ্য হইতে পারে। যদি তাহা সত্য হয় তবে, যে সকল নীহারিকা হইতে সহস্র সহস্র প্রচণ্ড সূর্য্যের রশ্মি একত্রিত হইয়া আসিলেও, নীহারিকাকে ঐ দূরবীক্ষণে ধূমরেখা মাত্রবৎ দেখা

যায়, নাজানি যে কত কোটি বৎসরে আলোক তথা হইতে আসিয়া আমাদিগের নয়নে লাগে। অথচ আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৯২০০০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর পরিধির অষ্টগুণ, যায়।

পণ্টন সাহেব জানিয়াছেন, যে রৌদ্রের আলোক, মডরেটর দীপের অপেক্ষা ৪৪৪গুণ তীব্র। যদি কোন সামগ্রীর দুই ইঞ্চি দূরে ১৬০টা মমবাতী রাখা যায়, তবে তাহাতে যে আলোপড়ে সে রৌদ্রের মত উজ্জ্বল হয়। গণিত হইয়াছে যে, যদি সূর্য্য রশ্মিবিশিষ্ট পদার্থ না হইত, তবে তাহাকে মমবাতীর সাতকোটী বিশলক্ষ স্তরে আবৃত করিলে, অর্থাৎ নয় মাইল উচ্চ করিয়া বাতীতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ মুড়িয়া, সকল বাতী জ্বালিয়া দিলে রৌদ্রের ন্যায় আলো পৃথিবীতে পাওয়া যাইত। কি ভয়ঙ্কর তাপাধার! সিনসিনেটির ডাক্তার ভন

স্থির করিয়াছেন, যে এক ফুট দূরে ১৪০০০ বাতী রাখিলে যে তাপ পাওয়া যায় রৌদ্রের সেই তাপ। আর সূর্য্য আমাদিগের নিকট হই- তে যত দূর আছে, ততদূরে থাকিলে ৩৫০০, ০০০০০০,০০০০০০,১০০০০০,০০০০০০ সং- খ্যক বাতী এক কালীন না পোড়াইলে রৌদ্রের ন্যায় তাপ হয় না। এ কথার অর্থ এই হই- তেছে যে, প্রত্যহ পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ দুইশত বাতীর গোলক পোড়াইলে যে তাপ সম্ভূত হয়, সূর্য্যদেব একদিনে তত তাপ খরচ করেন। তাঁহার তাপ যেরূপ খরচ হয়, সেইরূপ নিত্য২ উৎপন্ন হইয়া জমা হইয়া থাকে। তাহা না হইলে এই মহাতাপক্ষয়ে সূর্য্যও অল্পকালে অবশ্য তাপশূন্য হইতেন। কথিত হইয়াছে যে সূর্য্য দাহ্যমান পদার্থ হইলে এই তাপ ব্যয় করিতে দশ বৎসরে অপনি দগ্ধ হইয়া যাইতেন।

মসূরপূইলা গণনা করিয়াছেন, যে সতের মাইল উচ্চ কয়লার খনি পোড়াইলে যে তাপ জন্মে, এক বৎসরে সূর্য্য তত তাপ ব্যয় করেন। যদি সূর্য্যের তাপবাহিতা জলের ন্যায় হয়, তবে বৎসরে ২.৬ ডিগ্রী সূর্য্যের তাপ কমিবে। কুঞ্চন ক্রিয়াতে তাপ সৃষ্টি হয়। সূর্য্যের ব্যাস তাহার দশ সহস্রাংশের একাংশ কমিলেই, দুই সহস্র বৎসরে ব্যয়িত তাপ সূর্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে।

সূর্য্যের তাপশালিতার যে ভয়ানক পরিমাণ লিখিত হইল, স্থিরনক্ষত্রমধ্যে অনেক গুলিন তদপেক্ষা তাপশালী বোধ হয়। সে সকলের তাপ পরিমিত হইবার উপায় নাই, কেননা তাহার রৌদ্র পৃথিবীতে আসে না, কিন্তু তাহার আলোক পরিমিত হইতে পারে। কোন কোন নক্ষত্রের প্রভাশালিতা পরিমিত

হইয়াছে। আলফা সেণ্টরাই নামক নক্ষত্রের প্রভাশালিতা সূর্য্যের ২.৩২ গুণ। বেগা নক্ষত্র ষোড়শ সূর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট এবং নক্ষত্ররাজ সিরিয়স দুই শত পঞ্চবিংশতি সূর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট। এই নক্ষত্র আমাদিগের সৌরজগতের মধ্যবর্ত্তী হইলে পৃথিব্যাদি গ্রহ সকল অল্পকালমধ্যে বাস্প হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইত।

এই সকল নক্ষত্রের সংখ্যা অতি ভয়ানক! সর উইলিয়ম হর্শেল গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে কেবল ছায়াপথে ১৮,০০০,০০০ নক্ষত্র আছে। স্ত্রুব বলেন আকাশে দুই-কোটি নক্ষত্র আছে। মসূর শাকর্ণাক বলেন, নক্ষত্র সংখ্যা সাত কোটি সত্তর লক্ষ। এ সকল সংখ্যার মধ্যে, নীহারিকাভ্যন্তরবর্ত্তী নক্ষত্র সকল গণিত হয় নাই। যেমন সমুদ্র-

তীরে বালুকা, নীহারিকা সেইরূপ নক্ষত্র। এখানে অঙ্ক হারি মানে।

যদি অতি প্রকাণ্ড জগৎসকলের সংখ্যা এইরূপ অননুমেয়, তবে ক্ষুদ্র পদার্থের কথা কি বলিব? ইহ্রেণবর্গ বলেন যে এক ঘন ইঞ্চি বিলিন্ শ্লেট প্রস্তরে চল্লিশহাজার Gallionella নামক আনুবীক্ষণিক শম্বুক আছে—তবে এই প্রস্তরের একটি পর্ব্বতশ্রেণীতে কত আছে কে মনে ধারণা করিতে পারে? ডাক্তার টমাস টম্‌সন্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে সীসা, এক ঘন ইঞ্চির ৮৮৮,৪৯২০০,০০,০০,০০০ ভাগের একভাগ পরিমিত হইয়া বিভক্ত হইতে পারে। উহাই সীসার পরমাণুর পরিমাণ। তিনিই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে গন্ধকের পরমাণু ওজনে এক গ্রেনের ২০০,০০,০০,০০০ ভাগের এক ভাগ।

(সমুদ্রের গভীরতার পরিমাণ।)

লোকের বিশ্বাস আছে, যে সমুদ্র কত গভীর, তাহার পরিমাণ নাই। অনেকের বিশ্বাস যে সমুদ্র "অতল।"

অনেক স্থানে সমুদ্রের গভীরতা পরিমিত হইয়াছে। আলেকজান্দ্র্যা নিবাসী প্রাচীন গণিত ব্যবসায়িগণ, অনুমান করিতেন, যে নিকটস্থ পর্ব্বত সকল যত উচ্চ, সমুদ্রও তত গভীর। ভূমধ্যস্থ (Mediteranean) সমুদ্রের অনেকস্থানে ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তথায় এ পর্য্যন্ত ১৫,০০০ ফিটের অধিক জল পরিমিত হয় নাই—আলপ্স পর্ব্বত শ্রেণীর উচ্চতাও ঐরূপ।

মিশর ও সাইপ্রস দ্বীপের মধ্যে ছয়সহস্র ফিট, আলেকজান্দ্র্যা ও রোড্‌সের মধ্যে নয় সহস্র নয় শত, এবং মাল্‌টায় পূর্ব্বে ১৫,০০০

ফিট জল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তদপেক্ষা অন্যান্য সমুদ্রে অধিকতর গভীরতা পাওয়া গিয়াছে। হম্বোলটের কস্মস্ গ্রন্থে লিখিত আছে, যে এক স্থানে ২৬,০০০ ফিট রশী নামাইয়া দিয়াও তল পাওয়া যায় নাই—ইহা চারি মাইলের অধিক। ডাক্তার স্কোরেস্‌বি লিখেন যে সাত মাইল রশী ছাড়িয়া দিয়াও তল পাওয়া যায় নাই। পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চতম পর্ব্বত শৃঙ্গ পাঁচ মাইল মাত্র উচ্চ।

কিন্তু গড়ে, সমুদ্র কত গভীর, তাহা না মাপিয়াও গণিতবলে জানা যাইতে পারে। জলোচ্ছাসের কারণ সমুদ্রের জলের উপর সূর্য্য চন্দ্রের আকর্ষণ। অতএব জলোচ্ছাসের পরিমাণের হেতু, (১) সূর্য্য চন্দ্রের গুরুত্ব,(২) তদীয় দূরতা,(৩) তদীয় সম্বর্ত্তন কাল,(৪) সমুদ্রের গভীরতা। প্রথম, দ্বিতীয়, এবং তৃতীয় তত্ত্ব আমরা জ্ঞাত আছি; চতুর্থ আমরা জা-

নিনা, কিন্তু চারিটির সমবায়ের ফল, অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাসের পরিমাণ, আমরা জ্ঞাত আছি। এতএব অজ্ঞাত চতুর্থ সমবায়ী কারণ অনায়াসেই গণনা করা যাইতে পারে। আচার্য্য হটন এই প্রকারে গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে সমুদ্র, গড়ে, ৫.১২ মাইল, অর্থাৎ পাঁচ মাইলের কিছু অধিক মাত্র গভীর। লপ্লাস ব্রেষ্ট নগরে জলোচ্ছ্বাস পর্য্যবেক্ষণের বলে যে "Ratio of Semidiurnal Co-efficents" স্থির করিয়া ছিলেন, তাহা হইতেও এই রূপ উপলব্ধি করা যায়।

(শব্দ)

সচরাচর শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১০৩৮ ফিট গিয়া থাকে বটে, কিন্তু বের্থেম ও ব্রেগেট নামক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বৈদ্যুতিক তারে প্রতি সেকেণ্ডে, ১১, ৪৫৬ সেকেণ্ড বেগে

শব্দ প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতএব তারে, কেবল পত্র প্রেরণ হয় এমত নহে; বৈজ্ঞানিক শিল্প আরও কিছু উন্নতিপ্রাপ্ত হইলে মনুষ্য তারে কথোপকথন করিতে পারিবে।

মনুষ্যের কণ্ঠস্বর কত দূর যায়? বলা যায় না। কোন কোন যুবতীর ব্রীড়ারুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিবার সময়ে, বিরক্তি ক্রমে ইচ্ছা করে, যে নাকের চসমা খুলিয়া কাণে পরি, কোন কোন প্রাচীনার চীৎকারে বোধ হয়, গ্রামান্তরে পলাইলেও নিষ্কৃতি নাই। বিজ্ঞানবিদেরা এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দেখা যাউক।

প্রাচীনমতে আকাশ শব্দবহ; আধুনিক মতে বায়ু শব্দবহ। বায়ুর তরঙ্গে শব্দের সৃষ্টি ও বহন হয়। অতএব যেখানে বায়ু তরল ও ক্ষীণ, সেখানে শব্দের অস্পষ্টতা

সম্ভব। ব্লাঙ্ শৃঙ্গোপরি শব্দ অস্পষ্টশ্রাব্য বলিয়া শস্যোর বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন তথায় পিস্তল ছুড়িলে পটকার মত শব্দ হয়; এবং শ্যাম্পেন খুলিলে কাকের শব্দ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মার্শ্যাস বলেন যে তিনি সেই শৃঙ্গোপরেই ১৩৪০ ফিট হইতে মনুষ্যকণ্ঠ শুনিয়াছিলেন। এ বিষয় "গগনপর্য্যটন" প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ লেখা হইয়াছে।

যদি শব্দবহ বায়ুকে চোঙ্গার ভিতর রুদ্ধ-করা যায়, তবে মনুষ্য কণ্ঠ যে অনেক দূর হইতে শুনা যাইবে, ইহা বিচিত্র নহে। কেন না শব্দতরঙ্গ সকল ছড়াইয়া পড়িবে না। বিও নামক বিজ্ঞানবিৎ, পারিসের লৌহ-নির্ম্মিত জলপ্রণালী মুখে কর্ণ রাখিয়া ৩১২০ ফিট হইতে ফ্লুটের গীত শুনিতে পাইয়া-

ছিলেন। ফ্লুট কি, অতি মৃদু কাণে কাণে কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। যদি কেহ আপনার ঘরে খাটে শুইয়া, গৃহান্তরে বন্ধু প্রতিবাসীর সঙ্গে কথোপকথন করিতে চাহেন, তবে দুই গৃহের মধ্যে চোঙ্গা নির্ম্মাণ করিলেই তাহা পারেন।

স্থির জল, চোঙ্গার কাজ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চতায় বায়ু প্রতিহত হইতে পায় না—এজন্য শব্দতরঙ্গ সকল, ভগ্ন হইয়া নানা দিক্ দিগন্তরে বিকীর্ণ হয় না। এই জন্য প্রশস্ত নদীর এ পার হইতে ডাকিলে ও পারে শুনিতে পায়। বিখ্যাত হিমকেন্দ্রানুসারী পর্য্যটক পারির সমভিব্যাহারী লেপ্টেনাণ্ট ফষ্টর লিখেন, যে তিনি পোর্ট বৌয়েনের এ পার হইতে পরপারে স্থিত মনুষ্যের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন।

উভয়ের মধ্যে ১।০ মাইল ব্যবধান। ইহা আশ্চর্য্য বটে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার ডাক্তার ইয়ং কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। তিনি বলেন, যে জিব্রল্টরে দশ মাইল হইতে মনুষ্য কণ্ঠ শুনা গিয়াছে। কথা বিশ্বাসযোগ্য কি?

(জ্যোতিস্তরঙ্গ)

প্রবন্ধান্তরে কথিত হইয়াছে, যে আলোক ইথর নামপ্রাপ্ত বিশ্বব্যাপী জাগতিক তরল পদার্থের আন্দোলনের ফল মাত্র। সূর্য্যালোক, সপ্তবর্ণের সমবায়; সেই সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু অথবা স্ফাটিক প্রেরিত আলোকে লক্ষিত হয়। প্রত্যেক বর্ণের তরঙ্গ সকল পৃথক্ পৃথক্; তাহাদিগের প্রাকৃতিক সমবায়ের ফলে, শ্বেত রৌদ্র। এই সকল

জ্যোতিস্তরঙ্গ বৈচিত্রই জগতের বর্ণবৈচিত্রের কারণ। কোন কোন পদার্থ, কোন কোন বর্ণের তরঙ্গ সকল রুদ্ধ করিয়া, অবশিষ্টগুলি প্রতিহত করে। আমরা সে সকল দ্রব্যকে প্রতিহত তরঙ্গের বর্ণ বিশিষ্ট দেখি।

তবে তরঙ্গেরই বা বর্ণবৈষম্য কেন? কোন তরঙ্গ রক্ত, কোন তরঙ্গ পীত, কোন তরঙ্গ নীল কেন? ইহা কেবল তরঙ্গের বেগের তারতম্য। প্রতি ইঞ্চি স্থান মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার তরঙ্গের উৎপত্তি হইলে, তরঙ্গ রক্তবর্ণ, অন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় তরঙ্গ পীতবর্ণ, ইত্যাদি।

যে জ্যোতিস্তরঙ্গ এক ইঞ্চি মধ্যে ৩৭, ৬৪০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়; এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৪৫,৮০,০০,০০,০০,০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা রক্তবর্ণ। পীত তরঙ্গ, এক ইঞ্চিতে

৪৪০০০, বার, এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৫৩,৫-০,০০,০০,০০,০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়। এবং নীল তরঙ্গ প্রতি ইঞ্চিতে ৫১,১১০ বার এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৬২,২০,০০,০০,০০,০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়। পরিমাণের রহস্য ইহা অপেক্ষা আর কি বলিব? এমন অনেক নক্ষত্র আছে, যে তাহার আলোক পৃথিবীতে পঞ্চাশ বৎসরেও পৌঁছে না। সেই নক্ষত্র হইতে যে আলোক রেখা আমাদের নয়নে আসিয়া লাগে, তাহার তরঙ্গ সকল, কতবার প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে? এবার যখন, রাত্রে আকাশ প্রতি চাহিবে, তখন এই কথাটি একবার মনে করিও।

(সমুদ্র তরঙ্গ)

এই অচিন্ত্য বেগবান্ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, জ্যোতিস্তরঙ্গের আলোচনার পর, পার্থিব জ-

লের তরঙ্গমালার আলোচনা অবিধেয় নহে। জ্যোতিস্তরঙ্গের বেগের পরে, সমুদ্রের ঢেউকে অচল মনে করিলেও হয়। তথাপি সাগরতরঙ্গের বেগ মন্দ নহে। ষ্কিংল্ সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে অতি বৃহৎ সাগরোর্ম্মি সকল ঘণ্টায় ২০ মাইল হইতে ২৭॥ মাইল পর্য্যন্ত বেগে ধাবিত হয়। স্কোরেসবি সাহেব গণনা করিয়াছেন যে আটলান্টিক সাগরের তরঙ্গ ঘণ্টায় প্রায় ৩৩ মাইল চলে। এই বেগ ভারতবর্ষীয় বাষ্পীয় রথের বেগের অপেক্ষা ক্ষিপ্রতর।

যাঁহারা বাঙ্গালার নদীবর্গে নৌকারোহণ করিতে ভীত, সাগরোর্ম্মির পরিমাণ সম্বন্ধে তাঁহাদের কিরূপ অনুমান, তাহা বলিতে পারি না। উপকথায় "তালগাছ প্রমাণ ঢেউ" শুনা যায়—কিন্তু কেহ তাহা বিশ্বাস করে না। সমুদ্রে তদপেক্ষা উচ্চতর ঢেউ উঠিয়া থাকে।

ফিণ্ড্লে সাহেব লিখেন ১৮৪৩ অব্দে কর্ম্বা-লের নিকট ৩০০ ফিট অর্থাৎ ২০০ হাত উচ্চ ঢেউ উঠিয়াছিল। ১৮২০ সালে নরওয়ে প্রদেশের নিকট ৪০০ ফিট পরিমিত ঢেউ উঠিয়াছিল।

সমুদ্রের ঢেউ অনেক দূর চলে। উত্তমাশা অন্তরীপে উদ্ভূত মগ্ন তরঙ্গ তিন সহস্র মাইল দূরস্থ উপদ্বীপে প্রহত হইয়া থাকে। আচার্য্য বাচ বলেন, যে জাপান দ্বীপাবলীর অন্তর্গত সৈমোদা নামক স্থানে একদা ভূমিকম্প হয়। তাহাতে ঐস্থানসমীপস্থ "পোতাশ্রয়ে" এক বৃহৎ ঊর্ম্মি প্রবেশ করিয়া, সরিয়া আসিলে পোতাশ্রয় জলশূন্য হইয়া পড়ে। সেই ঢেউ প্রশান্ত মহাসাগরের পর পারে, সানফ্রন্‌সিস্কো নগরের উপকূলে প্রহৃত হয়। সৈমোদা হ-ইতে ঐ নগর ৪৮০০ মাইল তরঙ্গরাজ ১২

ঘণ্টা ১৬ মিনিটে পার হইয়াছিলেন অর্থাৎ মিনিটে ৬॥ মাইল চলিয়াছিলেন।

একবারে পূর্ণ শোভা ধারণ করিয়া উঠিয়াছিল? না, উপ্ত বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষাদি ক্রমে পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছিল?"

এই প্রশ্নের উত্তরে সর উইলিয়ম, আগ্নেয় পর্ব্বতের উদাহরণ দিয়া বলিয়াছেন যে, "বিসিউবিয়স বা এট্না পর্ব্বত নিঃসৃত অগ্নি-দ্রব পদার্থের স্রোত তৎসানুবাহী হইয়া না-মিলে, অচিরাৎ তাহা শীতল হইয়া জমিয়া যায়। কতিপয় সপ্তাহ বা বৎসর পরে, অন্য স্থান হইতে বায়াদি-বাহিত ডিম্ব এবং বীজের কারণ, অথবা অন্য স্থান হইতে স্বয়মাগত জীবের প্রসাদে, তাহা বৃক্ষ জীবাদিতে পরি-পূরিত হয়। যখন আমরা দেখি যে, সমুদ্র-মধ্যে অগ্নিবিপ্লবসমুৎপন্ন কোন দ্বীপ, কতিপয় বর্ষমধ্যে বৃক্ষাদিতে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, তখন তাহা যে বায়ুবাহিত, বা জলচর জীবাদি দ্বারা

আনীত বীজ হইতে ঐরূপ হইয়াছে, এপ্রকার সিদ্ধান্ত করিতে পরাঙ্মুখ হই না।”

তিনি বলেন যে, পৃথিবীতে সেইরূপ জীব-সর্গ। আকাশে, লক্ষ২ সূর্য্য, গ্রহ, উপ-গ্রহাদি অনবরত বিচরণ করিতেছে। যদি সমুদ্রমধ্যে লক্ষ২ জাহাজ, সহস্র বৎসর বিনা নাবিকে বিচরণ করে, তবে অবশ্য মধ্যে২ জাহাজে২ আঘাত হইবে। আকাশ সমুদ্রেও তদ্রূপ, পৃথিবীতে পৃথিবীতে কখন অবশ্য প্রহত হইবে। হইলে, তৎক্ষণাৎ প্রঘাত-জনিত তাপে প্রহত গ্রহাদির অধিকাংশ দ্রব হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু কোন২ ভাগ দ্রবীভূত না হইয়া উল্কাপিণ্ড ভাবে, আকাশপথে বিচ-রণ করিবে। ভগ্ন গ্রহে যেসকল ডিম্ব, জীব ও বৃক্ষাদি ছিল, তাহার কিছু না কিছু বীজ, গ্রহখণ্ডে অবশ্য থাকিবে। কালে তদ্রূপ

কোন সজীব গ্রহাংশ উল্কাপিণ্ড স্বরূপে পৃথিবীতলে পতিত হইয়া, তন্নাহিত বীজে পৃথিবীকে প্রথমে উদ্ভিজপূর্ণা, পরে জীবময়ী করিয়াছে।

এই মত, অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট অদ্যাপি গ্রাহ্য হয় নাই, এবং তাহার প্রতিবাদ করিবার বিশেষ কারণ আছে। ভাল, ইহার যাথার্থ্য স্বীকার করা যাউক। তাহা হইলে কি হইল? জীবসৃষ্টির ত কিছুই বুঝা গেল না। বুঝিলাম, এই পৃথিবী, অন্যগ্রহপ্রেরিত বীজে, উদ্ভিদ্ ও জীবাদি সৃষ্টিবিশিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সে গ্রহেই বা প্রথম বীজ কোথা হইতে আসিল? আবার বলিবেন, "অন্য গ্রহ হইতে।" আমরাও আবার জিজ্ঞাসা করিব, সেই গ্রহেই বা বীজ আসিল কোথা হইতে? এইরূপ পারম্পর্য্যের আদি নাই।

প্রথম বীজোৎপত্তির কথা যে অন্ধকারে ছিল, সেই অন্ধকারেই রহিল।